পারা তোলা আয়না

সুব্রত বসু

ডি লাইট বুক কোং

১৭৩/৩, বিধান সরণি, কলিকাতা—৬

প্রকাশক : শ্রীগোপাল চন্দ্র সাহা, এম-কম, এল-এল-বি, (এ্যাডভোকেট)

মুদ্রাকর ঃ তারকনাথ প্রিণ্টার্স ২।১, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

প্রকাশকাল : পৌষ ১৩৭০

প্রচ্ছদ : শৈলেন্দ্র নাথ দত্ত (মেশোমশাই)।

ভূমিকা

এ যুগের যন্ত্রণার সন্ধিক্ষণে আমার জন্ম। জন্ম আমার লেখারও। আর তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়াজড়ি করে এগিয়ে গেছে বাস্তব আর কল্পনা। এইটুকু বাদে আর বলতে পারি যুক্তিকে শুধুমাত্র উপভোগের উপহাসাস্পদ সংস্কারে রূপান্তরিত করার কোন ইচ্ছে আমার নেই। কোনও সথকে চূড়ান্ত রূপ দিয়ে মাতলামো করার জন্যও এ গল্প আমি লিখিনি। একটা ভয়ঙ্কর অথচ নিঃস্ব কিছুর তাগিদেই আমার প্রেরণা।

বইটা লিখেছিলাম বেশ কিছু আগে। মোটামুটি প্রাথমিক পর্যায়ের স্তরেই একে ফেলা যায়। ভুল ত্রুটি অবশ্যই কিছু থাকতে পারে। তবুও একটা আলোর দিকে আমার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে একে চিহ্নিত করছি এবং তার ভিত্তি যাচাই করতে চাইছি পাঠক পাঠিকার সমস্ত রকম আলোচনা ও সমালোচনার ফুল, ইঁট, পাথর বা গুলিকে নত মস্তকে গ্রহণ করার সাহস টুকু নিয়ে। আমি জানি পরীক্ষা দেওয়ার দাবীতে আমার অধিকার জন্মগত ও চিরন্তন। সবটুকুর শেষ কথা, এই পরীক্ষাই হবে আমার সাহিত্য ক্ষেত্রে ভবিষ্যত পদক্ষেপের নিয়ন্ত্রাতা।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশের রেওয়াজকে সুর না দিয়েই অকুণ্ঠচিত্তে বলতে বাধ্য হচ্ছি যারা না থাকলে ঘরের পাণ্ডুলিপির বোঝা আর সামান্য একটু ভারী হয়েই থাকতো হয়তো এতদিনেও, তাদের মধ্যে প্রথম নাম আমার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ যে আজও সেই শ্রীস্বপন কুমার দত্ত। বই লেখা বাদে বাকিটুকুর বেশীটাই যে করেছে। দ্বিতীয় শ্রীগোপী রায়। তৃতীয় আর একজন কর্ম-ক্ষেত্রের কারণে যার নাম প্রকাশ করতে পারছি না। এঁদের চেষ্টার মধ্যে কোন স্বার্থগন্ধ নাকে এসে লাগে নি।

সবশেষে প্রকাশক মহাশয় যাঁর সাহায্যই ছিল শেষ কথা।

বিনীত

৫৯।৬, ভূপেন রায় রোড
কলিকাতা—৩৪

শ্রীসুব্রত বসু

উৎসর্গ

সেই,

মা যাকে ডাকতেন 'তোতা'

বাবা 'সত্যব্রত'

আর আমরা 'কোম্পানী' বলে—

খুবই হঠাৎ আর নিষ্ঠুরভাবে এই পৃথিবীটা

ছিনিয়ে নিল যাকে কিছুদিন আগে।

একমাত্র সেই ছিল,

আজ সামান্য বুঝেই খুব আনন্দ ও গর্বে

যে মেতে উঠতে পারত।

সেই আমার ছোট্ট, সরল ভাইটি

তারই স্মৃতির উদ্দেশ্যে

তাকেই।

ধ্যাৎ বিরক্তি ধরে গেল ঝণ্টুর। হাঁ করে ঠাকুর দেখছে। ঠাকুরের :হ কি দেখার আছে। মা দুর্গা তো পরের কথা, প্রথমে সবাই দেখে সিংহ আর অসুরের কেরামতি। আর ঝণ্টুর তো মনেই পড়ছে না শেষের দুটো তিনটে প্যাণ্ডেলে ও আদৌ ঠাকুর দেখেছে কিনা। চোখের খারাপ দৃষ্টিটা শুধু এদিক আর ওদিক।

ঝণ্ট আবার দেখল, ওই ত লোকটা একটু এগিয়ে গেছে। বন্ধুদের থেকে একটু পেছিয়ে এসে ওদের দেখল, ধেনোটা আবার ওকেই বেশী লক্ষ্য করে। না ওদের নজর এখন দুটো ঝকমকে সাড়ীর দিকে।

কয়েক পা এগিয়ে মেয়েটার পাশ দিয়ে যাবার সময় ছোট্ট করে আলতো ভাবে একটু ধাক্কা দিয়ে সরে গেল। মেয়েটা ওর দিকে তাকাল, অনেকটা স্বাভাবিক ভাবেই আঙুলটা মুখের ওপর আনল। অর্থাৎ 'চুপ' হাত নেড়ে জানিয়ে দিল চলে যেতে। ব্যস, আর কিছু না এগিয়ে গিয়ে লোকটার হাত ধরল। কি বলল। বোধহয় চলে যেতে, আর সত্যিই প্যাণ্ডেল থেকে ওরা বেরিয়ে চলে গেল। ঝণ্টু একটু আশ্চর্য হয়ে ওদের চলে যাওয়া দেখতে লাগল।

"গুরু, এবার একটু এদিকে ফের, আর দুঃখ বাড়িয়ে লাভ কি।" ধেনোটা ঠিক দেখেছে, ঝণ্টু ফিরতেই দেখল সবাই ওকেই দেখছে। আর সবাই ততক্ষণে বেশ জোরে বোধ হয় জোর করেই হেসে উঠল।

ধেনো আর সতীশ এসে দুদিক থেকে ওকে জড়িয়ে ধরল।

তুই শালা সত্যিই গুরু মাইরি! তা কি ব্যাপার গুরু, কলা দেখিয়ে সটকে পড়ল কেন?

ছাড়—সতীশ ছেড়ে দিল আর সঙ্গে সঙ্গে ঝণ্টু ধেনোর পাঁজরে একটা গুঁতো মেরে এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিল।

সব সময় ফোর্থ ক্লাস, ইয়ার্কি ভাল লাগে না।

ধেনোটা সরে গিয়ে পাঁজরে হাত বুলোচ্ছে, ও বোধহয় একটু রেগেই গেছে। ফস করে মিন্টু একটা সিগারেট ধরিয়ে এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে ভুরু দুটো তুলে বলল—

কি রে ঝণ্টু, তুই যেন বেশ রাইগ্যা গেসিস মনে লাগসে। ব্যাপার স্যাপার যেন কিরকম কিরম লাগসস না?"

"তোরা কি দেখেছিস ?"

"যা দেখার সব, তোরে চুপ করতে কইল, হাত নেড়ে চলে যেতে কইল, তারপরে একটা লোকের হাত ধইর‍্যা বাইর হইয়া গেল। তোর দিকে একবারও ফিরল না।"

"বেশ করেছিস, চল্ ফিরবি, না আরও ঠাকুর দেখবি ?"

"কিরে ফিরবি ? অন্তত ঝণ্টুর লগে।" মিলু জোরে বলল কথাটা।

কিন্তু কেউই বিশেষ কিছু গ্রাহ্য না করার ভঙ্গীতে প্যাণ্ডেল থেকে বেরিয়ে এল।

রবি কোন কথাই বলল না। শুধু রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে খদ্দরের পাঞ্জাবীর খুঁট দিয়ে চশমা মুছে নিল।

ওদের ভেতরের আবহাওয়াটা হঠাৎ কি রকম অপরিষ্কার হয়ে গুমোট হয়ে গেল।

'ওই যে মেয়েটা দেখলি' ঝণ্টু চুপ করল।

মিলু এসে ঝণ্টুর কাঁধে আস্তে হাতটা রাখল।

বলে যাও দোস্ত, থামলে কেন ? মালটা ত বেশ খাসাই দেখলাম।

মিলু বাঙাল মার্কা ডায়ালগ ত্যাগ করে বলল।

চল ঐ ফাঁকা বেঞ্চিটায় বসি। ঝণ্টুর প্রস্তাবানুযায়ী সবাই পাশের বন্ধ ডিসপেনসারির সামনের এটা চওড়া সিমেন্টের বেঞ্চির ওপর গিয়ে বসল। ঝণ্টু সিটটা ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, "ঐ মেয়েটা আমাকে প্রায় পাগল করে ফেলেছিল।" ঝণ্টু নড়েচড়ে গুছিয়ে বসল।

বছর কয়েক আগে তখন আমি হাওড়ায়। নতুন চাকরীতে ঢুকেছি কিছুদিন হল। অফিস ছুটির পরেই আমাদের কয়েকজনের একমাত্র ডিউটি পিওর আলু বাজি। কিন্তু দেখে দেখে আর কতদিন ভাল লাগে। মেয়ে বুঝে চ্যাংড়ামিও করতাম—মাঝে মাঝে শরীরে যেন আগুন ধরে যায় আর যখন যা হোক একটা কিছু করার জন্যে মরীয়া হয়ে উঠেছি।

ঠিক তখনই একদিন, অফিস থেকে ফিরছি। রাস্তায় রবীনকে পেয়ে গল্প করতে করতে আসছি হঠাৎ চমকে উঠলাম। রবীনের হাতটা চেপে ধরে হাঁটার বেগ খুব আস্তে করে দিয়ে ওর কাঁধে কাঁধ দিয়ে ছোট্ট ধাক্কা মেরে বললাম কে রে ?

নতুন আমদানি। তুই এই প্রথম দেখলি ?

হ্যাঁ।

সামনের টিউবওয়েলটায় বউটা জল নিতে এসেছে! সোজাসুজি ওর শরীরটা চোখ দিয়ে গিলতে গিলতে চলে গেলাম। বউটা লজ্জা পেয়ে গায়ের কাপড়টা আরও টেনে দিল। একটু এগিয়ে যেতেই রবীন খিঁচিয়ে উঠল। তুই শালা যেমন টপ আলুবাজ, তাতে তোর সাথে আমরাই না কোনদিন ধোলাই খাই, তার ওপর ভুলে যাচ্ছিস কেন ওখানে রেড, সিগন্যাল আগেই পড়ে গেছে।

ভাল জিনিস দেখার রাইট সকলের আছে।

আছে। কিন্তু ওভাবে না। আমরাও দেখিত।

তুই থাম, ভীতু মার্কা সব। ঝণ্টু চাপা স্বরে বলল।

তবু রবীনই ওদের বাড়ির গলিটা চিনিয়ে দিল। নতুন ভাড়াটে।

বেশ কয়েকদিন পরে—কয়েক দিনই এ রাস্তায় ঘোরাফেরা করছি দেখতে পাইনি! সেদিন অফিস যাইনি, দুপুরবেলায় একলা আসছি ঐ পথ দিয়ে, দেখি বউটা কলসীতে জল ভরছে, সঙ্গে একটা ছোট মেয়ে। আমার জল পিপাসা পেল, কলটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম, বউটা আমাকে দেখে একটু হাসল। আর সেই হাসিতেই আমার কিরকম নেশার মত মনে হল! জল খাবার জন্যে হাত বাড়াতেই ও ছোট মেয়েটাকে ইঙ্গিত করল, মেয়েটা কল টিপতে লাগল, জলও পড়তে লাগল কিন্তু আমিও চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলাম।

আমার দিকে তাকিয়ে বউটা আবার মুখ টিপে হাসল আর আমার যেন রক্তে হঠাৎ আগুন ধরে গেল। একটু বাদে বউটা কল টিপল। আমি জল খেলাম সামান্যই। কিছুটা ভাব করে সময় কাটিয়ে মুখ তুলে সোজাসুজি দেখতে লাগলাম। বউটা কিন্তু আর হাসল না। কলসি নিয়ে মেয়েটাকে সঙ্গে করে চলে গেল! আমিও আশপাশ দেখে কেটে পড়লাম।

কিন্তু অবসর সময়ের বেড়ানোর রাস্তায় ভেতরেই ঐ রাস্তাটা প্রতিদিন কম্পালসারি পড়তে লাগল। আর সাহসটাও বেড়ে যেতে থাকল। দেখা করার সময়টা তখন জানা হয়ে গিয়েছে। প্রতিদিন সন্ধ্যে ছ'টা থেকে সাড়ে ছ'টা। অফিস থেকে ফিরে আসতে কোন অসুবিধা নেই, ঠিক সময়

মত কলসি হাতে নিয়ে কলের দিকে আসে। তখনও আমার পাবার মধ্যে ছিল কোনদিন একটা কোনদিন দুটো চকচকে হাসি! কিন্তু ওতে আমার যন্ত্রণা প্রতিদিন আরও বেড়ে যেতে লাগল, কোথাও যেতাম না আর। শুধু একটা চিন্তা আর ছটফট করা বিছানায় শুয়ে শুয়ে।

কিছুদিন বাদে আর সহ্য করতে পারলাম না। ও-পাড়ার সব সেরা রকবাজটার সাথে আগে মোটামুটি পরিচয় ছিল। সেটাকে ডেকে কনট্রাক্ট করে ফেললাম। ও হেসে বলল, ছোঃ এই কাজ—বলুন না কালই আপনাকে আর একটা টেষ্ট কবিয়ে দিচ্ছি, তবে একটু সাহস থাকা দরকার।

কি রকম?

কালকে ওই ধোপার মাঠে ভ্রাতৃসঙ্ঘের ফ্যাংসান আছে তো—শুনেছেন?

হ্যাঁ, থিয়েটারও হবে শুনেছি।

হ্যাঁ, থিয়েটার দেখতে যাবে যারা, সবাই কিন্তু থিয়েটার দেখবে না। বাড়ির পাশপোর্ট হবে থিয়েটার, কিন্তু কেউ কেউ যাবে প্রেম করতে ওখান থেকে সুরে গিয়ে। আমাদের কাজ তখন আরম্ভ হবে নির্জন জায়গায়। ওরা একসঙ্গে হলেই আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ব ছেলেটার ওপরে। আর মেয়েটাকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে অন্ধকারে। আর সেখানে আপনার কোন ভয় নেই। পুরো অন্ধকার, এতটুকুও শব্দ হবে না। এরকম প্রতিমাসেই এক-আধটা আমাদের জুটে যায়। কি পারবেন, সাহস আছে? বলেই হাতে একটা থাপ্পড় কষিয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ করে হেসে উঠল। রেগে গেলাম ওর ব্যবহারে। তবু সেটা চেপে বললাম—দরকার নেই, তোমাকে যা বললাম করতে পারবে কি?

খুব—ও আবার একটা কাজ নাকি? ঠিক আছে করে দেবখন, টাকাটা ছেড়ে কেটে পড়ুন।

দশটা টাকা ওর হাতে দিয়ে চলে গেলাম।

পরের দিন অফিস গেলাম না। এগারটার পর ওই গলিটাও নির্জন হয়ে গেল। কেউ গেল অফিসে, কেউ কেউ স্কুলে কলেজে। বারোটার পরেই আশপাশের সব দরজা বন্ধ হল, রকবাজটা খবর দিয়ে গেল।

আমি গিয়ে দাঁড়ালাম ওর ঘরের জানালার দিকে মুখ করে রাস্তার অন্ধ-দিকে।

একটু বাদেই জানালায় বউটার মুখ দেখা গেল, সঙ্গে একটু হাসি।

আমি ঠায় দাঁড়িয়ে থাকলাম প্রায় সারাদিন, মাঝে শুধু দুবার গলির পেছন দিক থেকে ঘরে আসলাম আর জানালায় তিরিশ চল্লিশ মিনিট অন্তর হাসি হাসি মুখটা উঁকি দিয়ে একটু বাদে আবার চলে যেতে থাকল।

রকবাজটা পাহারায় ছিল গলির সামনে।

বিকেল হতেই কেটে পড়লাম। আর সন্ধ্যেবেলায় ও গেল জল নিতে। জল নিয়ে চলে গেল, একটু বাদে আমিও ঢুকলাম গলিতে। আশে পাশে দেখে দরজাটা ঠেললাম আস্তে, ভেজানো ছিল। রকবাজটা জানিয়েছিল ওর স্বামী রাত্রি ন'টা দশটার আগে কোনদিন ফেরে না। ঘরে ঢুকে খিল দিলাম।

জানালাটা বন্ধ ছিল। আর ও একটু দূরে বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। সংকোচটা কাটিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে ওর দু'কাঁধে হাত দিলাম—ও কিছু বলল না।

কি নাম তোমার ?

বুড়ী।

বুড়ী ?

ও হঠাৎ হেসে উঠল।

কেন ছুঁড়ি বলে গালাগাল দিতে চাও নাকি ?

কত বয়েস হয়েছে ?

বাবাঃ সব জানা চাই। কত আর হবে, সেই সেদিন ছিল পনের, তারপর ষোলো, সতেরো আঠারো, উনিশ—হ্যাঁ উনিশই হবে।

তুমি গ্রামের মেয়ে ?

হ্যাঁ।

তুমি আমাকে এভাবে ডেকে আনলে কেন ?

ওমা, সেকি ? তুমি আমার পেছু নিয়ে নিয়ে আজ এসে ঘরে ঢুকলে আর বলছ আমি ডেকে এনেছি।

আমি কেন এসেছি বুঝতে পারছ ?

কেন পারব না ? তোমরা যেজন্য আস সেইজন্যে, আবার কি ?

আমি এতক্ষণে উত্তেজিত হলাম তবু বললাম।

তোমার সঙ্কোচ হচ্ছে না ? তুমি বাধা দেবে না।

না।

সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে আলোটা নিবিয়ে দিয়ে ওকে পেঁচিয়ে নিয়ে খাটের ওপর ফেলে চেপে বসলাম।

সিগারেট দে—হঠাৎ ঝণ্টু হাতটা বাড়িয়ে দেয়।

যাঃ, থি লটাই মাটি করে দিলি।

যা বে শালা এইখানে কাটলি। মিলু আর সতীশ প্রায় সমস্বরে চিৎকার করে উঠল।

সিগারেট দে—ঝণ্টু আবার হাতটা পাতে।

রবি পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে সকলের হাতে দেয়! দেশলাইটা বের করে ঝণ্টুর হাতে দেয়।

নেক্সট চান্সে, আমি বিড়ি সাপ্লাই দেব। ধেনো বলে উঠল, মিলুর সিগারেট থেকে সিগারেটটা ধরাতে ধরাতে!

এইবার রবি একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বলল—যদিও বোঝা যাচ্ছে লাইনের মেয়ে, তবু একটা বউ যে তার স্বামীর সঙ্গেই থাকে তার সঙ্গে হঠাৎ এভাবে সক্রিয়াল ট্রেম-এ আসা! বুঝলাম সে তোকে দেখে অনেকবার হেসেছে, তোকে তার ভালও লেগেছে, কিন্তু তার ত অন্য রকম মানেও হতে পারে।

ঝণ্টু খিঁচিয়ে উঠল।

রাখ্ রাখ্ তোর ঐ বড় বড় বাত্। ভাই বোনের কথা বলছিস না খুড়ো জ্যেঠা বানানোর চেষ্টা ? তোদের ঐ কাব্যিক প্রেমের নাম শুনলে আমার মায়া হয়, যত সব ভীতু মড়ার দল! মানুষের সঙ্গে কেন বাপ—যা ঐ তারার সঙ্গে প্রেমের স্বর্গীয় ভালবাসার জীবনটা কাটিয়ে দে। ফ্রয়েডের কোন থিয়োরি পড়েছিস ? পারিস তো একবার পড়ে নিয়ে ঐ সব তোদের কাব্যিক প্রেমের মহড়া দিস।

রবির মুখটা দেখা গেল না, শুধু সিগারের জ্বলতে থাকা অংশটুকু ছাড়া গম্ভীর ভাবে শুধু বলল, তোর সাহস আছে।

হ্যাঁ, ছোটবেলায় শোনা বীরভোগ্যা বসুন্ধরা কথাটা সব সময় আমি মনে রাখি। আর সাহসের কথা বলছিস ? সাহস আমার থেকেও ওর অনেক বেশী। জেনে রাখিস মেয়েরা যতটা চিন্তা করে, অনুভব করে তা

প্রকাশ করে অতি সামান্য! আর যেটুকু করে তার চোখের মধ্যে দিয়ে আর একটু আধটু হাবে ভাবে। আর তুমি যদি তার মুখ দিয়ে সব শুনতে চাও, তাহলে তোমাকে আমড়া চুষেই কেটে পড়তে হবে।

মিলু লাফ মেরে দাঁড়িয়ে পড়ে সিগারেট শুদ্ধ হাতটা টেনে দেখিয়ে বলল, রবি তোর ভাল না লাগে তো ভাগ। যতসব জ্ঞান পাপী।

ধেনো সিগারেটটা ছুঁড়ে নর্দমায় ফেলে দিল। পকেট থেকে বিড়ি বের করতে করতে বললো, শালা বিড়ি না হলে এসব জমে? হ্যাঁ শোন বাপ রবি, কোন মেয়ের সাথে লাইন করেছ—করে থাক ত এই বেলা সটকে পড়। নাহলে ল্যাং খেয়ে হাত-পা গুঁড়ো হবে। আর বন্ধুর উপদেশ যদি শোনো তো বলি, বিয়ে কোর না। আটষট্টি সালের মেয়ে। দেখবা কোনদিন অন্য কার সঙ্গে কেটে পড়েছে। সবাই হো হো করে হেসে উঠল।

ধেনো—সতীশ টেনে টেনে বলল চুপ কর একটু, বুঝছি তোর নেশা জমে উঠেছে।

ধেনো উত্তর দিতে যাচ্ছিল, মিলু থামিয়ে দিল। রবি চুপচাপ সিগারেট টেনে চললো।

ওঃ, প্রথম দিনেই যা পেলাম সে তোদের বলে বোঝাতে পারবো না! ঝোঁকের মাথায় কি করেছিলাম মনে নেই। তবে ওর শরীরের কোন কাপড় চোপড় খুলে ফেলতে বাকি রাখিনি। বুকের কথা ত বাদ দিলাম। সমস্ত শরীরের সমস্ত অংশ তখন আমি হাতড়ে চলেছি। আর আশ্চর্য, এত নরম শরীর, তবু মনে হতে লাগল গায়ে ওর কী ভীষণ জোর, কখনও কখনও আমার চেয়ে বুঝি বেশী। সমানে ও সাড়া দিচ্ছিল আমার উন্মত্ততার সঙ্গে, আর তাতে যে কি আনন্দ হচ্ছিল, কি তৃপ্তি পাচ্ছিলাম—

ধেনো খুক খুক করে কেশে উঠল। আস্তে আস্তে বল বাবা—ওঃ মেজাজ বিগড়ে দিয়েছিস একেবারে। এরপর রাত্রিতে আর ঘুম আসবে না। ঝন্টু আরম্ভ করল।

আবার ঘণ্টা দেড়েক বাদে আমাকেই ওই জোর করে ওর শরীরের ওপর থেকে পাশে সরিয়ে দিয়ে অন্ধকারেই হাতড়ে হাতড়ে ওর জামা কাপড় সব খুঁজে নিয়ে পরে নিল। আমাকেও ঠিক হয়ে নিতে বলল। তারপরেই ও ঘরের আলো জ্বালল। আমি ঠিক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়তেই ও বলল।

এবার এসো,।

তোমার স্বামী আসার সময় হয়েছে ?

না, আরও আধ ঘণ্টা কি এক ঘণ্টা পরে আসবে।

ও, বলেই আমি এগিয়ে দরজাটা খুলে ফাঁক করে এদিক ওদিক দেখতে লাগলাম।

ভয় নেই, এ সময় এ গলিতে বড় একটা কেউ থাকে না।

ওটুকু শুনেই টুক করে রাস্তায় নেমে এলাম।

সামনের দিক দিয়ে যেতে সাহস হল না। গলির পেছন দিক দিয়ে চলে গেলাম।

কিন্তু সেদিন গেলে কি হবে, এক দিনেই নেশা জমে গেল।

সাঙ্ঘাতিক নেশা, মদের নেশা ওর কাছে কিছু না।

সেই যে বলে না, বাঘ যদি রক্তের স্বাদ পায়। আমিও যেন সেই রক্তের স্বাদ পেয়ে পাগলের মত হয়ে গেলাম। তাই পরের দিন আবার ছুটলাম। দরজা খোলাই ছিল। কোন রকমে দরজাটা দিলাম। কি একটা সেলাই করছিল খাটের ওপর বসে। আমার অস্বাভাবিক মূর্ত্তি দেখেই বোধহয় তাড়াতাড়ি সেটা ছুঁড়ে রেখে দিল।

আর সঙ্গে সঙ্গে আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম। তাড়াতাড়ির চোটে ত ব্লাউজ বডিস দুটো ছিঁড়েই ফেললাম।

ধেনো লাফিয়ে উঠল। ঝণ্টু, তার চেয়ে তুই আমাদের মেরেই ফেল। কি করেছিস তুই এঁ্যা।

চোপ, মিলু ধমকে উঠল। ধেনো বসে পড়ল।

শেষকালে খুব খারাপ লাগছিল, নিজেকে একটা জঘন্য ইতর মনে হল। বুঝতে পারছিলাম ওর শরীরে আজ খুব যন্ত্রণা দিয়েছি। ও বলল তোমাকে তো আমি কোন বাধা দিতাম না, তবে এরকম করলে কেন ?

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে চলে আসলাম। রাস্তায় এসেই নিজের ওপর ঘেন্নায় মনটা বিষিয়ে গেল। ভাবলাম অন্ততঃ কিছুদিন আর যাব না। কিন্তু ওই রক্তের স্বাদ—অফিসেই মন বসাতে পারি না কিছুতেই। শুধু ঘড়ি দেখি কখন সাড়ে পাঁচটা বাজবে। বাড়ি এসে কোন রকমে একটু কিছু খেয়েই ব্যস—বাড়িতেও আমার সম্বন্ধে বিশেষ কেউ মাথা ঘামায় না। মা ত নেই,

ছোট বোনটা স্কুলে পড়ে, বাবা দাদা সবাই আমার পরে বাড়ি ফেরেন। সুতরাং—

যাই হোক, তার পরের দিনও গেলাম। তারও পরের দিন। অফিসের চেয়েও বড় ডিউটি যেন হয়ে গেল একটা। বন্ধু-বান্ধব আড্ডা সব ভুলে ধুলোর মত করে উড়ে চলে গেল।

এমনি ভাবে কিছুদিন কাটল। একদিন ঐ ভাবে ওর খোলা শরীরটা নিয়ে যা খুশী তাই করেছি মুখে চুমু খেয়ে তারপরে বুকের মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে দিয়ে বললাম চল আমরা পালিয়ে যাই!

হাত দুটো দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরে ও হঠাৎ হেসে উঠল। তারপরে বলল খুব আস্তে যেন চুপি চুপি কোথায়?

যেখানে পারি, তবে এখান থেকে অনেক দূরে।

আবার হি হি করে হেসে উঠল।

কেন এখানে তোমার অসুবিধে হচ্ছে?

না, অসুবিধের কথা হচ্ছে না। কিন্তু তোমার স্বামী যদি কোনদিন জানতে পারেন?

তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার, নিস্পৃহ গলায় বুড়ি বলে।

কিন্তু আমরা যখন দুজনে দুজনকে ভালবাসি—তখন আলাদা ঘর বাঁধতে দোষ কি? ওকে আরও জোরে চেপে ধরতে গেলাম, কিন্তু ও হাত ছাড়িয়ে দিয়ে উঠে বসল।

যা পেতে এসেছ তাই নিয়ে চলে যাও। আজেবাজে ওসব কথা বলে কি লাভ?

ওর এই কথা আর গলার স্বর শুনে আমার যেন জ্ঞান ফিরে এল, বললাম।

তার মানে।

ও আলোটা জ্বালল, চুলটা ঠিক করে নিল, ব্লাউজের বোতাম লাগাতে লাগাতে বলল—তারমানে, যা সত্যি তাই বলেছি।

কি সত্যি?

তোমাদের ভালবাসার যা মানে তাই!

আমি এবার গলার স্বরটা গম্ভীর করলাম।

আমি কি তোমাকে ধোঁকা দিচ্ছি বলে মনে কর ?

এখন হয়ত নাও হতে পারে, পরে হবে। আমাদের মত মেয়েদের সঙ্গে তোমরা, যারা শিক্ষিত ভাল বংশের চাকুরে ছেলে তাদের সঙ্গে এই পর্য্যন্ত হতে পারে তার বেশী নয়। একটু পুরনো হয়ে গেলেই তখন আমাকে দেখে তোমার শুধু ঘেন্না লাগবে। আর দশজন বন্ধু-বান্ধবের অন্য সব ভাল ভাল মেয়ে দেখে তখন শুধু তোমার মনে হবে তুমি ঠকেছ। সেদিন সত্যিই হয়ত তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে অন্যখানে। আর আমি গিয়ে বেশ্যা পাড়ায় নাম লেখাব না ? এখানে আমি দুটো খেতে পাচ্ছি শান্তিতে আছি। এই আমার স্বর্গ, কোথাও যেতে চাই না আমি ওকে ছেড়ে।

আমার.বেশ রাগ হয়ে গেল। একটু ব্যঙ্গ করেই বললাম।

দেখ আমার কিন্তু একটু হেঁয়ালীর মত লাগছে। আমার কুৎসিৎ চরিত্রটা এত সুন্দর ও সত্যি করে জেনেও তোমার সতীত্ব বলতে যা বোঝায় তা বেমালুম আমার ভোগে লাগিয়ে দিচ্ছ। আবার পতির সঙ্গে স্বর্গে বাস করে সাংঘাতিক সতীত্ব বজায় রাখছ, তাও বলছ। এখন দুটোর কি এক মানে বুঝব। না অন্য কিছু ?

বুড়ী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাকে একবার দেখে গম্ভীর স্বরে বলল। না অন্য কিছু নয়।

আস্তে আস্তে গিয়ে ও খাটের ওপর বসল। সেলাইয়ের সরঞ্জাম নিয়ে দেখলাম একটা নকশার ওপর ও ফুল তুলছে। সেলাই করতে করতেই বলল।

তুমি যে সতীত্বের কথা বলছ, সেটা আমার অনেকদিন আগেই চলে গেছে। তোমাকে নতুন কিছু দিইনি, যা দিয়েছি আমার স্বামীর কাছে তার কোন মূল্য নেই। তিনি জানেন, আমার মনের সবটুকু জুড়ে তিনি আমিও তাই জানি ! আর তিনি এসবের সব কিছুই জানেন। আমি তাঁর কাছে কিছু গোপন করি না।

আমি চমকে উঠলাম ওর কথা শুনে। একটু ঘাবড়েও গেলাম। বললাম, আমার কথাও জানেন ?

তোমাকে চেনেন না, প্রয়োজনও মনে করেন না। তবে তোমাকে শরীর দেবার আগে তাঁর অনুমতি চেয়েছিলাম। তিনি হেসেই আনন্দের সঙ্গেই অনুমতি দিয়েছিলেন।

আমি ভীষণ ঘাবড়ে গেলাম ওর কথা শুনে, বলে কি ?

আমার মাথায় কি রকম গোলমাল লেগে গেল। কিছুই যেন বুঝতে পারছিলাম না কি ব্যাপার! তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

একটা দোকানে এক প্যাকেট সিগারেট কিনে নিয়ে ঢুকলাম। একটা চা নিয়ে দুটো সিগারেট শেষ করলাম। তাড়াতাড়ি এসে চুপচাপ খেয়েদেয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। কিন্তু মন থেকে কিছুতেই বুড়ীর চিন্তা কাটাতে পারলাম না। সাফ বলে দিল আমি ভালবাসা বলতে ওদের শরীরটা বুঝি ? আর ও ত অনেক কথা বলেছে। শুয়ে শুয়ে শুধু ওর কথাগুলো চিন্তা করতে লাগলাম। হ্যাঁ প্রথম দিকের কথাগুলোর মানে তবু বোঝা যাচ্ছে। ভাল করে ভেবে দেখলাম, আমার সম্বন্ধে ওর যা চিন্তা সেটা নেহাৎ বাজে নয়। সত্যিই তো। আজ পর্যন্ত যতো—

ধুর যত বাজে চিন্তা। কেন যে ভালবাসাবাসি মার্কা সেন্টিমেণ্টের কথা বলতে গেলাম! ভাবলাম, ওসব বাজে সেন্টিমেণ্টের কোন মূল্য নেই। কম করেও শতকরা আশী ভাগ ছেলে ত আমার দলের। প্রেম ভালবাসা ভাঁওতা মারার সুবিধের জন্যে। আজও কামুক মার্কা টপ আলুবাজগুলো ঐগুলোকে কাজ হাসিলের জন্যে ইউজ্ করে যাচ্ছে। যাক্, মেয়েটার শেষের কথাগুলো শুধু গোলমাল পাকাতে লাগলো মাথার মধ্যে। সাফ বলে দিল, পর পুরুষকে শরীর দেওয়া ওর নতুন নয়। আবার তা ওর স্বামীর অনুমতি নিয়ে। শুনে মনে হয় টাকা পয়সার ব্যাপার হতে পারে, কিন্তু তাতো নয়। একদিন যা রেগেছিল, অবশ্য বলেছিলাম বেশ ঘুরিয়েই।

যাই হোক আমার চিন্তা হতে লাগল। এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোন ব্যাপার আছে। আর কেনই বা ওর স্বামীকে ছেড়ে অন্য পুরুষের সঙ্গে দেহের সম্পর্ক।

যাব না যাব না করে অতি কষ্টে দুটো দিন আর গেলামই না। কিন্তু কি যে হয়, সন্ধ্যে হলেই মনটা ছটফট করতে থাকে। আর ততদিনে ওর ওপর কি রকম একটা মায়াও পড়ে গেছে। থাকতে পারলাম না, আবার ছুটলাম সেইদিন সন্ধ্যেবেলা। দেখলাম ঠিক একই ভাবে খাটের কোনায় বসে বসে সেলাই করছে। আমাকে নিস্পৃহ ভাবে দেখল।

বস!

বসলাম খাটের অন্য কোণায়! ওকে দেখতে লাগলাম! হ্যাঁ সত্যিই ওকে দেখতে সুন্দর। খুব সুন্দর! একটু চমকে উঠলাম, ও বলল।

দু-দিন আসনি বুঝি রাগ করে?

কিছু বললাম না, ওকে দেখতে লাগলাম।

একটু বাদে আমি দাঁড়াতেই ও বলে উঠল আজকে থাক।

কেন?

শরীরটা খারাপ।

কি হয়েছে?

ও হেসে উঠল—ভুরু দুটো কৌতুকের ভঙ্গীতে তুলে বলল তোমাকে বলতে হবে? সবকিছু অত জানার আগ্রহ ভাল নয়। হঠাৎ গম্ভীর ভাবে একটা কথা বলে ফেললাম।

মানুষের সম্বন্ধে মানুষের জানার আগ্রহ থাকাই স্বাভাবিক। কুকুর বেড়ালে নিশ্চয়ই মানুষের—

একটু হেসে বাধা দিল। হ্যাঁ, ওরাও করে সে থাক। জেনে রাখ শুধু, যে মেয়েদের এমন অনেক অসুখ আছে যা ছেলেদের হব না। তাদের তা বোঝবার কথাও নয়।

বুঝলাম, তবু আমি কিন্তু উঠে যাওয়ার কোন চেষ্টাই করলাম না। কিছুক্ষণ চুপচাপ ওর সেলাই করা দেখলাম। একটা ময়ুর প্রায় শেষ করে এনেছে। বোঝা যাচ্ছে সম্পূর্ণটা হলে বেশ সুন্দরই দেখতে লাগবে।

তবু বেশীক্ষণ এ ভাবে চুপচাপ থাকাটা অসহ্য। হঠাৎ বললাম তোমার বক্তব্যের শেষটুকু বল।

শেষটুকু? মুখ তুলে তাকাল।

হ্যাঁ, দুদিন আগে যে কথাগুলো বলেছিলে তার শেষটুকু।

ও, সেই কথা। আবার সেলাইয়ে মন দিল। একটু গম্ভীর ভাবে বলল, ওর আবার প্রথম আর শেষ কি? তবে একটা কথা সেদিন মুখ ফুটে বলিনি তুমি বুঝে নিতে পারবে বলে।

কি সেটা?

আমার স্বামী পুরুষত্বহীন।

তুমি বিয়ের আগে জানতে না?

ও মুখ তুলে আমাকে দেখল আস্তে বলল, জানতাম।

তবু বিয়ে করলে ? আমি আশ্চর্য্য হয়ে বলে উঠলাম।

হ্যাঁ।

আমি ব্যগ্র ভাবে বলি কিন্তু কারণটা কি ? তোমার এত সুন্দর চেহার আর তুমি এরকম একটা লোককে বিয়ে করলে ! কেন অন্য কোন পুরুষ—

না, ছিল না। আমি ওর জোরালো চিৎকারে থমকে গেলাম।

ও বেশ রেগে গেছে মনে হল। আস্তে আস্তে বলল—

তোমার কৌতূহল বড্ড বেশী যা শুনেছ তাই। ব্যস, আর কোন কারণ জানতে চেয়ো না।

আমারও রাগ উঠে গেল ওর কথা বলার ভঙ্গীতে। তবু যথাসম্ভব চেপে বললাম, কিন্তু আমাদের কাছে যে রকম অনায়াসে শরীর দিচ্ছ এটা ত ব্যভিচার। এতে তোমার পাপ হচ্ছে না ? তুমি সমাজকে ভয় পাও না ?

না পাই না—ওর চিৎকারে ঘাবড়ে গেলাম। ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে ওর হাতের সেলাইয়ের সরঞ্জাম। উত্তেজনায় ও খাটের ওপর দাঁড়িয়ে পড়েছে। ঠক ঠক করে কাঁপছে। চোখগুলো ঠেলে যেন বেরিয়ে আসছে। আমি ভয় পেয়ে গেলাম ওর এই অস্বাভাবিক ব্যবহারে। হঠাৎ ও বিছানার ওপরেই পা দিয়ে দুম দুম করে লাথি মারতে লাগল। আমি ঘৃণা করি—ঘৃণা করি তোমাদের সমাজকে।

এ্যাই কি হচ্ছে পাগলের মত ?

আমি ভয় পেয়ে ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলাম ওকে। আস্তে আস্তে কিরকম নিস্তেজ হয়ে পড়ল আমার হাতের ওপরে। আর আমিও ওকে যত্ন করে বিছানায় শুইয়ে দিলাম। তখনও অল্প অল্প কাঁপছে। শরীরটা গরম, কপালে ঘামের ফোঁটা দেখা দিয়েছে।

তাড়াতাড়ি একটা হাত-পাখা জোগাড় করে বাতাস দিতে লাগলাম। পাশ ফিরে শুয়ে আচ্ছন্নের মত ও বিড়বিড় করে কি সব বলতে লাগল, কানটা ওর মুখের পাশে নিয়ে যেতে দু-একটা কথা কানে এল কি অন্যায় করেছি আমি···কেন ? কেন তোমরা আমাকে এত শাস্তি দাও···বল তোমরা···আমি কি ? কি করেছি তোমাদের···

আমি ঘাবড়ে গেলাম খুব। কিরে বাবা—শেষ কালে পাগল হয়ে গেল

নাকি! নিজের ওপর এ্যাইসা রাগ হতে লাগল। কেন যে শেষের ওই ছাই কথাগুলো বলতে গেলাম! একটু বাদে তাকিয়ে দেখি ঘুমিয়ে পড়েছে। একটা চাদর গায়ের ওপর টেনে দিয়ে পাখাটা রেখে দিয়ে খুব আস্তে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে রাস্তায় নেমে এলাম।

সামনে তাকাতেই বুকটা ধড়াস করে উঠল। আশপাশের বাড়ির দুটো লোক একটু দূরে দাঁড়িয়ে। আর ওরা লক্ষ্য করছে আমাকেই। তাড়াতাড়ি উল্টোদিকের গলিতে পা চালিয়ে দিলাম। ইস্, কি ভুলই না করলাম। তাড়াতাড়িতে বাইরেটা না বেরোনোর। তাড়াতাড়ি চলছি, কিন্তু আমাকে যেন ভীষণ ভাবে তাড়া করে নিয়ে চলেছে ঐ বউটার সেই উদ্‌ভ্রান্ত ভুতুড়ে মূর্তি। কানে ভাসছে একটা চিৎকার আমি ঘৃণা করি—ঘৃণা করি তোমাদের সমাজকে। কিন্তু কেন? কেন সমাজের ওপর এই প্রচণ্ড আক্রোশ? কি করেছে সমাজ ওর!

ধেনো! সাপ্লাই দে শীগগির। ঝন্টু হাত বাড়ায়, তারপর ধেনো তাড়াতাড়ি বিড়ি দিল ঝন্টুর হাতে। সবাই হাঁ হাঁ করে উঠল। আমাদের দিবি না?

নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই, পুরো প্যাকেটেই এখন পকেটে পড়ে।

ধেনো সবাইকে বিড়ি দিল! রবির দেশলাই দিয়ে দিয়ে বিড়ি ধরিয়ে সবাই টেনে চলল একমনে!

ঝন্টু খক্ খক্ করে কেশে উঠল। শালা বিড়ি খেলেই কাশি আসে। দূর—ছুড়ে ফেলে দিল।

কটা বেজেছে রে মিলু?

মিলু পকেটে ঢোকান বাঁ হাতটা চোখের সামনে এনে ঘুরিয়ে ধরল বেশী না মোটে সোওয়া ন'টা। কুছ পরোয়া নাই, তুই তোর গল্প চালাইয়া যা।

ঝন্টু ওর গল্প চালিয়ে গেল!

বুঝতে পারছিলাম আমার চলাফেরা একটু বেপরোয়া হয়ে যাচ্ছে। ধরা পড়ার ভয়ও কম না। কিন্তু তখন আমার জমজমাট নেশা আর তার অধিকাংশ তখন আর শরীর জানার জন্যে নয়। ওকে জানার। ওকে জানতে হবে, এটাই তখন আমার বড় নেশা! পরের দিন গিয়ে বললাম, তোমার গল্প শেষ করো।

গল্প কিসের গো ? ও হেসেই খুন।

দারুণ ভাল লাগতে লাগল ওর হাসির ভঙ্গী দেখে। কি সুন্দর ঝকঝকে আর উজ্জ্বল মনে হতে লাগল। অবাক হয়ে দেখছি আর ভাবছি এত সুন্দর করে ওকে আগে বোধহয় কোনদিন লক্ষ্যই করিনি! আর আশ্চর্য ওর ওই শরীর যা আমাকে পাগল করে তোলে রোজ। যার সমস্ত খুঁটিনাটি পর্যন্ত আমার মুখস্থ সেটাই আরও সুন্দর লাগছিল। জানি, এই মুহূর্তে আমি ঝাঁপিয়ে পড়লেও ও বাধা দেবে না, তবু আমি ওর কাছে যাওয়ার কোন চেষ্টাই করলাম না। শুধু কালকের দেখা সেই মেয়েটা [সে আজকের এই মেয়েটাই কিনা মিলিয়ে দেখতে লাগলাম।

ও মুখের ওপরে এসে পড়া কয়েকগাছি কোঁকড়া চুল হাত দিয়ে সরিয়ে মুখটা একটু সরিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বলল।

জান, পাশের বাড়ির লোকেরা বোধহয় বুঝতে পেরেছে তোমার কথা। আর বাড়িওয়ালাও সন্দেহ করছে।

জাহান্নমে যাক্।

হুঁ, তোমার আর কি ? আমাদেরই বোধহয় শীগগির উঠে যেতে হবে।

সে কি! আমি চমকে উঠে বললাম আমার জন্যে ?

না গো, তোমার জন্যে কি আর ? আমরা এমনিতেই কোথাও খুব বেশী দিন থাকি না।

হুঁ।

বুঝলাম ও আমাকে আঘাত দিতে চায় না। তবু অনুশোচনা হতে লাগল নিজের ওপর। কিরকম একটা ঘেন্নাও হতে লাগলো। কি জানি কেন কত রকমের চিন্তা যেন ঘাড়ে এসে চাপতে লাগলো আর যত চাপতে লাগল তত খারাপ মনে হতে লাগল। মনে ভাববার চেষ্টা করলাম, ছাড় শালা—ভাবুকতা এনেছ কি কলা চুষেছ। এসব করবে একদল আর তোরা মজা লুটবি। যেখানে যা পাবি সব শালা খেয়ে ছড়িয়ে একাকার করবি। কিন্তু কি যে হল—কি যে হল। এই মালটা হাতছাড়া হয়ে যাবে বলেই কি, না তা না ত।

কি হল ? আমি চমকে উঠলাম, কখন অন্যমনস্ক হয়ে গেছি খেয়ালই নেই আবার বলল।

এত চিন্তা করতে লেগে গেলে। তোমাদের কি আছে এত চিন্তার।

আর দোষ তো তোমার না।

মনে মনে বললাম, না দোষ আমার না।

শোন যা শুনতে চাচ্ছিলে। একটু থেমে বলল।

কি, ইচ্ছে আছে শোনার ?

সেই জন্যেই ত আজকাল আসছি, ও ভুরু দুটো বেঁকিয়ে বলল।

না হলে বুঝি আসতে না আর ? বাবাঃ, এর মধ্যেই এত পুরোন অম্বর পচা হয়ে গেলাম ? তোমরা সত্যিই আশ্চর্য্য।

আমি একটু ব্যগ্রভাবেই বলে উঠলাম, তুমি আমাকে ভুল বুঝছ বুড়ী। আমাদের কামনাটা হয়ত একটু উগ্র কিন্তু তাই বলে কি মনুষ্যত্বের আর কোন অনুভূতি থাকতে নেই।

হাতের সেলাইয়ের সরঞ্জামগুলো পাশে সযত্নে রেখে দিতে দিতে বলল, থাক্, অনেক বড় কথা বলে ফেলেছ, আরও বেশী বললে—

আমরা মুখ্যু সুখ্যু মানুষ হয়ত কিছুই বুঝতে পারব না।

আমি ব্যঙ্গটা নিঃশব্দে হজম করে চুপচাপ ওর মুখের দিকে চেয়ে বসে থাকলাম, ধরে নিলাম এটাই এখন আমার ডিউটি।

পা দুটো-তুলে বিছানায় গুছিয়ে বসল। আরম্ভ হল বুড়ীর কাহিনী। বুড়ী বলে আর আমি শুধু শুনি, কত মুহূর্ত কেটে যায় হিসেবের বেনিয়মে। আমি যেদিন পৃথিবীর আলো দেখলাম, মার চোখ থেকে সেদিন পৃথিবীর আলো নিবল। আমাকে বাবার কাছে রেখে তিনি চলে গেলেন। আর বাবার রাগ এসে পড়ল আমার ওপরে। আমার আর এক দাদা ছিল। আমার চেয়ে চার পাঁচ বছরের বড়। বাবা কাজ-কর্ম সেরে বাড়িতে এসে দাদাকে নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। দাদার সঙ্গে চারটে কথা বললে আমার সঙ্গে বলতেন একটা। আমি বড় হতে লাগলাম। তখনও বাবার সেই এক ব্যবহার। দু-একটা দরকারে ছাড়া কথাই বলতেন না প্রায়। আমার যে কি কষ্ট হত, মাঝে মাঝে ঘরে বসে একা একা কাঁদতাম আপন মনে। আমার দাদা কিন্তু আমাকে খুব ভালবাসত! দু-এক দিন আমার কান্না ওর চোখে পড়ে গেছে।

ও আমাকে জড়িয়ে ধরে কত আদর করে বলত কাঁদছিস কেন বোন ?

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতেই বলতাম ঃ

বাবা তোকে কত ভালবাসে, আর আমি যেন কোথাকার কে।

দাদা মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলত—

না রে বোন—বাবা তোমাকে খুব ভালবাসে। তবে তুই যে হওয়ার সময় মা আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন, বাবা ভুলতে পারেন না সেই কথা—বাবা মাকে না খুব ভালবাসতেন।

চোখ বড় বড় করে বলত।

জানিস, আমাদের মাকে দেখতে কত সুন্দর ছিল। বারে আমি কি বোকা—তুই ত মাকে দেখিস নি কোনদিনই, ঠিক ঐ যে পটের লক্ষ্মী ঠাকুর, ঐ রকম। তোকে অনেকটা সেই রকম দেখতে সেই মা যখন আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন—

মা'র কথা বলতে গিয়ে দাদার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে আসত। দাদা কাঁদত আমিও কাঁদতাম। কাঁদতে কাঁদতে কতদিন আমরা বিছানার চাদর ভিজিয়ে ফেলেছি—তবু আমাদের কাঁদা শেষ হ'ত না। একদিন যখন ঐ ভাবে কাঁদছি তখন আমি দাদার গলা জড়িয়ে ধরে বললাম, "দাদা, আমার কি দোষ বল তো? মা কি আমার জন্য চলে গেছেন? আমি কি অলুক্ষুণে না?"

সেই দাদাও আমাদের ছেড়ে চলে গেল। একদিন হঠাৎ দাদা বাড়ী এসে যন্ত্রণায় কাতরাতে লাগল। বাবা ডাক্তারকে খবর পাঠালেন। ডাক্তার ওষুধ দিয়ে 'একটু পরে যাচ্ছি' বলে বাবাকে পাঠিয়ে দিলেন। বাবা বাড়ি এসে তাড়াতাড়ি ওষুধটা খাইয়ে দিলেন। কিন্তু সেটা ভেতরে গেল না—দাদার যন্ত্রণা যেন সহ্য করা যাচ্ছিল না। তখনও কাটা ছাগলের মত হাত পা ছুঁড়ছে—বাবা আর আমি পাগলের মত ছুটোছুটি করে একবার জল দিয়ে মাথা ধুইয়ে দেওয়া, পাখার বাতাস করা এই সব করতে লাগলাম।

একটু বাদে তাড়াতাড়ি ডাক্তার এসে দেখলেন—তারপরে ব্যাগ থেকে একটা ইঞ্জেকশান বের করে সাজিয়ে-গুজিয়ে ওষুধ পুরে দাদার হাতে চালিয়ে দিলেন। তার পরেই বাবার কাছ থেকে টাকা কড়ি বুঝে নিয়ে চলে গেলেন। একটু পরেই দাদা আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে গেল। মনে হ'ল বুঝি ঘুমিয়ে পড়ল।

সত্যিই সে ঘুমিয়ে পড়ল—কিন্তু সে এমন ঘুম যে আর কোনদিন ভাঙবে

না। যখন বুঝতে পারলাম---তখন সব শেষ। হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে শক্ত হয়ে গেছে---শুধু আমাদের চিৎকার করে কান্নাটা বাকী ছিল, আমরা তাই আরম্ভ করলাম। পাড়া-পড়শীরা অনেক আগেই এসেছিল তারাও তাতে যোগ দিল। আমি দেখলাম ছেলের কত কাঠ কাটছে আমাদের আমগাছটার। বাঁশ কেটে দড়ি দিয়ে কি সব তৈরী করছে---আমার কান্না বন্ধ হয়ে গেল শুধু চুপচাপ সব কিছু দেখে যেতে লাগলাম। ঐ ত আমার দাদা, আমার শান্ত দাদা চিরদিনের মত একেবারে শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। বুড়ী চুপ করল—

আমি বললাম, 'আশ্চর্য্য ব্যাপার তো! পেটের যন্ত্রণা কমল না।' গম্ভীর স্বরে বলল, "ডাক্তারে ভুল ইঞ্জেকশান করেছিল—মরফিয়া"। "মরফিয়া" আশ্চর্য হয়ে বলি, "তোমরা ওই খুনীটাকে ছেড়ে দিলে?" "কিই বা হবে আর। সে তো ফিরে আসবে না। তাছাড়া অনেকে বলেছিল কেস করতে। অত টাকাও আমাদের ছিল না মনে ইচ্ছেও ছিল না।" শেষের কথাগুলো যেন ফিস ফিস করে বলল বুড়ী।

তাকিয়ে দেখি ভাল করে—কি গভীর দৃষ্টি দিয়ে হাঁটুতে মুখ গুঁজে মেঝের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আর চোখের কোণ বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছে।

আমি চুপচাপ দেখে যেতে লাগলাম আর শুনতে লাগলাম কিন্তু আমি একটু ঘাবড়ে গেলাম হঠাৎ ও চীৎকার করে উঠল, "ওই যে আমার বাবা কত দূর থেকে যেন চিৎকার করতে করতে ছুটে আসছে।

খুকী তুই পালা খুকী তুই পালা, ওরা আমাকে মেরে ফেলছে আমায় মেরে ফেললো গো!" বুড়ীর গলা যেন ভেঙ্গে গেল।

আমি চমকে উঠলাম ওর ওই অস্বাভাবিক চিৎকারে। ও খাটের পাশে দাঁড়িয়ে পড়েছে চোখ দুটো ঠিকরে যেন বেরিয়ে আসতে চাইছে। "কি হল বুড়ী তুমি অমন করছ কেন?" আমি জোরে কথা বলতেই ও যেন হঠাৎই আমাকে আবিষ্কার করল। একটু শান্ত হয়ে বলল, জান বাবার সেই শেষ চিৎকার আজও আমার কানে ভাসছে, বাবা সেই সাংঘাতিক রাত্রিতে চীৎকার করতে করতে এসে বাড়ির একটু দূরেই পড়ে গিয়েছিলেন। আর পেছনে তাড়া করে আসা জন্তুগুলো বোধহয় সেখানেই তাঁকে পিটিয়ে মেরে

ফেলেছিল। ওরা বাবার কাছে আমাকে চেয়েছিল শুধু ওদের খাবার হিসেবে।

বাবা তাঁর জীবন দিতে পেরেছিলেন তবু আমাকে তুলে দিতে পারেন নি ওদের হাতে।

আমি হঠাৎ যেন কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে বলে ফেললাম—

“সে কার, কারা তারা।”

আঙুলটা তুলে ঘরের ছাদের কোনা দেখাল। আমি বোকার মত সেদিকে তাকাতেই ও বলল, “এই অনেক দূরে একটা নদী আছে তার পারে একটা যে নতুন দেশ হয়েছে না—সেই পাকিস্থান দেশের একদল লোক তারা।”

ও বলতে লাগল, জান সেদিন আমি কিন্তু ওদের হাত থেকে অনেক কষ্টে পালাতে পেরেছিলাম কিন্তু তোমাদের দেশে পা দিয়েই আর আমি নিজেকে বাঁচাতে পারলাম না।

দাদা মারা যাওয়ার সময় আমার বছর তেরো বয়স। তখনই আমি বেশ বড় হয়েছি আর তার এক বছরের মধ্যেই আমার শরীরে যেন জোয়ার এল। শাড়ী আগেই ধরেছিলাম তবু রাস্তায় বেরলেই পুরুষগুলোর ধারাল চোখগুলো যেন কিছুই মানত না। ভাল করে কাপড় জড়িয়ে চললেও ওদের সামনে দিয়ে গেলে কি লজ্জা যে লাগত! এমনিতে বাবার বয়স তখনও পঞ্চাশ হয়নি। কিন্তু দাদা মরে যাওয়ার পরেই কয়েকমাস বাদে বাবা যেন কি রকম হঠাৎ বুড়ো হয়ে গেলেন। স্বাস্থ্যও ভেঙে পড়ল, আগের মত খাটতেও পারতেন না তবু কোনরকমে দুজনের খাওয়া চলে যেত।

বাবা শেষ কালটায় বাতের ব্যথায় ভুগতেন হাঁটতেন একটু কুঁজো হয়ে। বাবাকে দেখে ভীষণ কষ্ট হত আমার। দাদার কথা মনে পড়ত, মাঝে মাঝেই সে বলত, “জানিস বোন বাবার না ভীষণ দুঃখ মাকে যে খুব ভালবাসতেন বাবা, সেই মা যখন চলে গেলেন তখন বাবা কি রকম করে মরা মার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। কি রকম যেন বোবা হয়ে গিয়েছিলেন কিছুদিন।”

সে দাদাও আজ নেই কি কষ্ট যে হত আমিই সব অলক্ষণের মূল! একটা রাক্ষস এসেছি এ সংসারে। বাবা আমাকে কাছে ডেকে বসাতেন বলতেন, “কি এত সব সময় চিন্তা করিস খুকী?”

আমি কিছু বলতাম না। শুধু বাবার দিকে তাকিয়ে থাকতাম। বাবাও

এক একদিন আমার দিকে তাকিয়ে কিরকম উদাস হয়ে যেতেন। বুঝতাম মার কথা চিন্তা করছেন কারণ আমি জানতাম আমাকে দেখতে আমার মার মতন। দাদা মরে যাবার আগে কতবার বলত সে কথা। পাড়া-পড়শিরাও আমাকে এই কথা বলত। আর বাবার সেই একদিনের অস্বাভাবিক ঘটনা মনে পড়ে।

সন্ধে হয়ে গেছে। সেদিন লক্ষ্মীপূজার। আমি বারান্দায় আলোটা রেখে একটু দূরের আমগাছটা থেকে একটা আমের পল্লব ছিঁড়ে আনবার জন্যে ওর তলায় দাঁড়িয়ে খুঁজছি। লক্ষ্মী পূজা করব তাই একটা পরিষ্কার লালপেড়ে শাড়ী আমি পরেছিলাম। আলোটা ঠিকমত এত দূরে এসে পৌঁছয়নি। তাই আছে অন্ধকার, হঠাৎ চমকে উঠলাম বাবার চীৎকারে "কে?—কে ওখানে দাঁড়িয়ে?"

'বাবা, আমি।' আবার বাবা ভাঙা গলায় চিৎকার করে উঠলেন, "কে? কে তুমি?" আমি ভয় পেয়ে ছুটে বাবার কাছে গিয়ে বললাম, "আমি—আমি তোমার খুকী।" অন্ধকারে বাবাকে ধরতেই দেখি সেটা থরথর করে কাঁপছে।

আরো ভয় পেয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠি, "বাবা তুমি অমন করছ কেন?"

না কিছু না। আস্তে আস্তে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন আমার যেন মনে হল, "ও যেন ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। সে এইরকম একটা শাড়ী পরত কি না, তাই মনে হল।"

আমি বাবাকে ধরে ঘরের দিকে নিয়ে চললাম।

তুই ওখানে কি করছিলিরে খুকু?

লক্ষ্মী পূজার জন্য আমের পল্লব পাড়তে এসেছিলাম।

যা, পেড়ে নিয়ে আয়।

'থাক এখন একটু পরে আনব।'

দাদা মরে যাবার পরে বাবার যেন চোখের মণি হয়ে উঠলাম আমি। বেশীক্ষণ আমাকে ছেড়ে বাইরে থাকতে পারতেন না। কাজটুকু সেরেই বাড়ি চলে আসতেন। কাছে ডেকে বলতেন, "খুকী তুই বড় হয়ে উঠেছিস এবার তোকে আমি একটা ভাল জায়গায় বিয়ে দেব। আগে ছেলেকে এনে তোকে দেখাব তুই বর পছন্দ করবি। আমি তোকে জোর করে কারও সঙ্গে

নিয়ে দিচ্ছিন।" বলে আপন মনে হেসে উঠলেন। "কেন পছন্দ হল না কথা—ওঁ।—এই খুকী।"

কৃত্রিম গম্ভীর গলায় মুখ বাঁকিয়ে বললাম, "পাননি কি?"

"কেন? খুব খারাপ কথা বললাম?"

চোখ বড় বড় করে বাবার কাছে মুখ নিয়ে বললাম, "না না তুমি খুব ভাল কথা বলেছ কিন্তু আমাকে বিয়ে করবার জন্যে অত ভাল ছেলে আসবে কেন? আমরা তো গরীব আমি তো মুর্খ। ওর দিকে চেয়ে ... হবার স্বপ্ন দেখে।"

বাবা হাসিমুখে বললেন, "তুই খুব ... এখন বলছে কে তোকে? ... শুধু টাকার জোরে বিয়ে ... ভাল পাত্রই নয়, দেখিস তার থেকেও ভাল ছেলে তোর জন্যে আনব। তবে টাকার পরোয়া করে না।"

বাবা গলার ভঙ্গীতে বললাম, "গরীব বলে হয়ত হতে পারি কিন্তু সবাই বুকে হাত দিয়ে বলুক তো আমার মেয়ের মত এক জন আর গুন এ গ্রামের কটা মেয়ের আছে?

আমি হেসে ফেললাম বাবার কথায়। আর অবসর সময় বসে বসে আর বাড়িতে বিছানায় শুয়ে শুধু স্বপ্ন দেখতাম আর কি!

"কিগো মশাই।" বুড়ি হঠাৎ বলে উঠল।

আমি একটু চমকে উঠে বললাম "হঁ্যা শুনছি।"

"কি শুনছ।"

বোকার মত হেসে বললাম, "কি আবার এই সব তুমি যা বলছ তাই।"

"একটা কথা শুনে রাখ মেয়েদের বেশী রূপ থাকাটাই তাদের জীবনের একটা সবচেয়ে বড় অভিশাপ। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তারা সুস্থ ভাবে বাঁচতে পারে না।"

আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। কি রকম একটু বেখাপ্পা লাগল তবু চুপ করে থাকলাম।

ফস করে দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে রবি একটা সিগারেট ধরাল। 'আমাকে একটা দেত।' ঝণ্টু হাত বাড়াল।

'একটাই আর আছে।'

'ঠিক আছে ওটাই দে।'

রবি সিগারেট দিল ঝণ্টুর হাতে।

থেমো পকেট থেকে বিড়ি বের করে নিঃশব্দে মিলু আর সতীশকে দুটো দিয়ে নিজে একটা বিড়ি ধরাল দেশলাইটা রবির কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে।

মিলু ঘড়িটা দেখে বলল, "এগরোটা দশ।"

সতীশ বলল "হ্যাঁরে মিলু এই প্যাণ্ডেলটার মাইক বাজছে না কেনরে।"

কে জানে? দেখিস তো বিকেল থেকেই মাইক বন্ধ হইয়া আসে ভালই হইসে না হইলে ঝণ্টুর ওই বুড়ীর গল্প শুনা হইত না। কি কেসে ঝণ্টু ঠিক কইসি না।"

হুঁ তার পরে শোন। ঝণ্টু আরম্ভ করে বুড়ীর জবানবন্দী। তখন সেই যুগ চারিদিকে আগুন জ্বলছে দেশের সব সোনার ছেলেদের মধ্যে প্রাণ দেবার জন্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে। রক্ত-বোমা-বন্দুক-পিস্তল এই নিয়ে ইংরেজের ভাড়াটে পুলিশ আর বিপ্লবীদের সঙ্গে বিভৎস নেশার মত যুদ্ধ হচ্ছে এখানে সেখানে।

বাবা আসতেন রোজ কিছু ঘটনা মুখে করে নিয়ে। আমাকে বলতেন আমি অবাক হয়ে শুনতাম। মনে মনে কতদিন প্রণাম করেছি তাদের সেই সব ছেলেদের। কি ভীষণ দুঃখ লাগত ইচ্ছে হত তাদের শুধু একবার দেখি। তাদের কাউকে যদি একবার প্রণাম করতে পারি তাহলেই যেন আমার জীবন সার্থক। তখন দিনরাত শুধু তাদের কথাই চিন্তা করতাম।

বাবা বলতেন, "জানিস খুকী ইংরেজ আর বেশী দিন এ দেশে থাকতে পারবে না; দেখিস।"

চোখ বড় বড় করে বলতাম, "কি করে ওদের তাড়াবে বাবা। ওদের গায়ে যে অনেক জোর। ওরা হয়ত গুলী করে সব্বাইকে মেরে ফেলবে।" "দূর তুই একটা বোকা।" বাবা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গী করে তার পরে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলতেন, "দেখছিস না আমাদের হীরের টুকরো কচি কচি ছেলেগুলো কত বুকের রক্ত ঢালছে।" এত অমূল্য সব জীবনের দাম কি মিথ্যে হতে পারে। তুই যে কি বলিস ক'জনকে মারবে ওরা দেখিস একদিন ঠিক পালাবে ওরা ভয় পেয়ে। আস্তে বলতেন প্রায় আপন মনেই এত রক্ত এত তাজা জীবন দেওয়া সে কখনো মিথ্যে হতে পারে রে? আর সত্যি তারা পালাল কিন্তু

পালানোর আগে শেষ মরণ-কামড় দিতে ছাড়ল না। দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে এ দেশটাকে দুটো টুকরো করে দিয়ে গেল। আমাদের নেতারা তাই দেখলেন দাঁড়িয়ে স্বাধীনতা ভোগ করার জন্যে। চারিদিকে তখন লেগে গেল হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা। এতদিন যারা ছিল ভাই ভাই তারা একে অন্যের রক্ত নেবার জন্যে মেতে উঠল। যারা শুনেছি এতদিন পাশে পাশে থেকে লড়াই করেছে তারাই নিজেদের মধ্যে খুনের নেশায় পাগল হয়ে উঠল। আর আমরা আশ্চর্য হয়ে একদিন শুনলাম, জন্ম জন্মান্তরের আমাদের এই বাপ ঠাকুরদার জমিতে আমাদের আর কোন দাবী নেই। আমরা এখন পরদেশী—বাবা সেদিন পাগলের মত হাত দুটো আকাশের দিকে তুলে বলে উঠেছিলেন, "হা ভগবান—সব মিথ্যে, সব মিথ্যে করে দিলে তুমি—কেন?"

চিৎকার করে বলে উঠেছিলেন—"কেন আমরা কি অপরাধ করেছিলাম কি অপরাধ করেছিলাম।"

'মিথ্যে মিথ্যে এ স্বাধীনতা।'

আমি ছুটে গিয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠেছিলাম, "বাবা ওগো বাবা তুমি চুপ কর আমার ভয় করছে ভীষণ ভয় করছে।"

মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলেছিলেন, "বল তো খুকি আমরা এখন কোথায় যাব? কোথায় যাব আমরা? হে ভগবান তুমি বলে দাও।" বাবার গলার স্বর কি রকম যেন ভেঙে এসেছিল একটু বাদেই দেখি বাবার চোখ দিয়ে দরদর করে জল গড়িয়ে পড়ছে। আমিও বাবার বুকে মুখ রেখে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলেছিলাম সেদিন। কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের গ্রামের অধিকাংশ হিন্দু পরিবার যা কিছু পারল নিয়ে ওদেশ ছেড়ে চলে গেল! আমাদের প্রতিবেশী পরিবারেরও অধিকাংশ ঘর বাড়ী ছেড়ে চলে গেল—যে পারল সে জলের দামে সব কিছু বিক্রী করে দিয়ে গেল—শুধু আমাদের মত হতভাগা দু একটা পরিবার মাটি কামড়ে পড়ে থাকল। আর কিছুদিন বাদেই আমার জীবনের ওপর অভিশাপ ঘনিয়ে এল সেটা ভাল ক'রে বুঝলাম সেইদিন। একদিন একটু দূরের দোকানে গিয়েছিলাম নুন কিনতে। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়েছিল কয়েকটা ছেলে। ছোটবেলা থেকেই ওদের দেখছি একই গ্রামের প্রতিবেশীর মত কোনদিন বিধর্মী ব'লে ওদের আলাদা করেও মনে হয়নি। কিন্তু সেদিন আমি

ওদের দিকে এক ঝলক তাকিয়েই বুঝলাম ওরা আমার চরম শত্রু। পুরুষের দৃষ্টির কি অর্থ তা আমরা অনেক কম বয়সেই বুঝতে পারি। সেদিন ভীষণ ভয় হ'ল বুঝলাম ওদের চোখের ছায়ায় আমার ধ্বংসের ইঙ্গিত।

ছুটে বাড়ী এসে আয়নাটা নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমার মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত দেখতে লাগলাম। কাপড়টা খুলে ফেলে আয়নায় যত আমার ভরা যৌবনের চেহারা দেখতে লাগলাম তত ভয় হতে লাগল। আয়নাটায় এক সময় মুখ দেখতে দেখতে ঘেমে উঠলাম। চোখ বড় বড় হয়ে গেল ভয়ে—চিৎকার করে ভয় পেয়ে আয়নাটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বিছানায় আছাড়ে পড়ে কেঁদে উঠলাম হে ভগবান! কেন আমায় এত রূপ দিলে—কেন দিলে ওগো ভগবান—আমি কি করে ওদের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাব বলে দাও, বলে দাও আমায় শুধু একবার!—কত কাঁদতাম আপন মনে। এক সময় দেখি বালিশের একটা দিক একেবারে ভিজে গেছে। আমি উঠে গিয়ে ঘরের কোণ থেকে ফাটা [illegible] আয়নাটা নিয়ে এসে মুখ দেখতে গেলাম। কিন্তু দেখেই আঁতকে উঠলাম। তাড়াতাড়ি কাপড়টা পরে নিয়ে ছুটে গিয়ে আয়নাটা আমাদের একটা পুকুরে ফেলে দিয়ে এলাম।

কিছুদিনের মধ্যেই লক্ষ্য করলাম বাবার কপালেও নতুন চিন্তার রেখা ফুটে উঠেছে! বুঝলাম সমস্ত আমাকে নিয়েই। তবে বাবা মুখে কিছু বলতেন না বিশেষ। বিকেল থাকতেই বাড়ী ফিরে আসতেন। আর ঘরের মধ্যে চুপচাপ খিল দিয়ে আমাকে আগলে বসে থাকতেন। একদিন বললেন, "খুকী তোকে নিয়ে আমি একদিন চলে যাব এদেশ ছেড়ে। শিগ্‌গিরই যাব।"

কিন্তু বাবার আর ওদেশ ছাড়া হয়নি। সে দেশেই সাংঘাতিক ভাবে পিটিয়ে বাবাকে মেরে ফেলল গুণ্ডাগুলো, ওদের হাতে আমাকে না তুলে দেবার জন্যে।

সে আরও কিছুদিন পরের কথা।

তার আগে আর একজনের কথা একটু বলা দরকার।

গোলাম সেখ! আমাদের বাড়ি থেকে একটু দূরেই থাকত।

ও শহরের কোন একটা কলেজে পড়তে যেত রোজ সাইকেলে চড়ে।

মাঝে মাঝে ও আমাদের বাড়ি আসত। আমি গোলাম দা বলতাম।

কোন কোনদিন দেখতাম ওর সঙ্গে আরও কয়েকজন বন্ধুবান্ধব নিয়েও রাস্তা দিয়ে ঘুরে বেড়াত।

বিপদ যেন আরও ঘনিয়ে আসছে—আমি সেদিন কিছু দূরের এক পাড়াতে মাসীমার মুখে শুনলাম আমাকে বিয়ে করার জন্যে এ গ্রামের একদল মুসলমান ছেলের মধ্যে জোর প্রতিযোগীতা লেগে গেছে। খবরটা এতদিন নিশ্চয়ই বাবার কানে পৌছুতে বাকী নেই বুঝলাম।

সেদিন বাবা বাড়ী ফিরতেই লক্ষ্য করলাম থমথমে মেঘের মত মুখটা শুকিয়ে গেছে—দুশ্চিন্তা আর ভয়ে বাবা যেন কি রকম হয়ে যাচ্ছেন। আমিও ভয়ে জড়সড় হয়ে খাটের এক কোনায় বসে থাকলাম। একটু বাদে গোলামদা এল।

বাবাকে বলল, "আপনার কোন ভয় নেই অন্ততঃ এটুকু ভেবে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে আমরা বেঁচে থাকতে আমাদের বাড়ির মা বোনদের মত বুড়ীর ইজ্জতও আমাদের কাছে এতটুকু কম মূল্যবান নয়। কেউ ওর গায়ে হাত দেবার আগে অন্ততঃ আমাদের মেরে ফেলতে হবে।"

বাবা গোলামদার হাতটা ধরে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলে ভাঙ্গা গলায় বলেছিলেন, "দেখো বাবা রেখো তোমার কথা।" বিড় বিড় করে বলেছিলেন, "ওর চিন্তায় আজ কদিন রাত্তিরে আমার চোখের ঘুম উড়ে গিয়েছে।"

যাবার সময় গোলামদা বলে গেল, "ভাববেন না যে আমি একা। আমার সঙ্গে আমার বন্ধুরাও আছে। প্রয়োজন হলে ওরাও ছুটে আসবে আমার মতন।"

আমাকে ডেকে বলল, "এই বুড়ী ঘরে বসে বসে কি চিন্তা করছিস যা আগের মত খেলে ছুটে বেড়া ভয় কি আমরা তো এখনও বেঁচে আছিরে— যা যা কাজ কর।"

গোলামদা চলে গেল—আমি ওর দিকে তাকিয়ে আবছা আলোয় শুধু ওকে অন্ধকারে চলে যেতে দেখলাম। ভাবতে লাগলাম ওই লোভী কামাত পশুগুলোরও এদের মত মানুষের চেহারা। তারাও কথাবার্তা বলে এরাও বলে। সবাই ই মানুষের মত তবু কত তফাৎ।

তবু সেদিন রাত্রিরেই বাবা বললেন, "খুকি আমরা পাঁচ সাত দিনের মধ্যেই একদিন রাত্তিরে পালিয়ে যাব পাশের গ্রামের শেষে যে বর্ডার আছে সেই

ইছামতী দিয়ে ওপারে। তার পরে কিছু না হয় একটা মুটে বা কুলির চাকরি তো জোগাড় করতে পারব তাতেই দুজনের কাষ্ট সৃষ্টে চলে যাবে এখনও আমি তো অক্ষম হইনি। শুধু তোকে যেদিন একটা ভাল জামাইয়ের হাতে তুলে দিতে পারব—সেদিন আমি একদম নিশ্চিন্ত তার পরে মরেও শান্তি। কি বলিস ঠিক না।"

বাবা করুণভাবে হাসলেন।

আমিও 'হ্যাঁ' বলে একটু হাসার চেষ্টা করলাম কিন্তু হ'ল না ঠিক। আমি বাড়ি থেকে বের হওয়া একদম বন্ধ করে দিলাম।

সব সময় দরজায় খিল লাগান থাকে। বাবা বেরিয়ে যাবার সময় বারবার বলে যেতেন। আর দু এক ঘণ্টা অন্তর নিজেই একবার করে বাড়ি ঘুরে যেতেন। তবু বাবাকে দেখলেই আমার কান্না ঠেলে আসত। কি রকম যেন আরো বেশী বুড়ো হয়ে গেলেন কয়েকদিনেই। একদিন বললেন, "খুকি আমাদের দু একদিনের মধ্যেই পালাতে হবে। জমিটা বিক্রী করার চেষ্টা করছি। সে খবরও ঐ শুয়োরগুলোর কানে উঠেছে। উঃ অসহ্য। খুকী তুই যা দু একটা জিনিসপত্র বাসনকোসন আছে একটা কি দুটো ছোট্ট পুঁটলিতে গুছিয়ে রাখিস জমি বিক্রী না হলেও আমরা চলে যাব। এখানে থাকলে তোকে আমাকে দুজনকেই ঐ গুণ্ডাগুলো মেরে ফেলবে।"—বাবা বলতে বলতে কি রকম হাঁপাতে লাগলেন। আমি বাবাকে কোন রকমে তাড়াতাড়ি খাইয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলাম। আস্তে আস্তে এক সময় মনে হ'ল বাবা ঘুমিয়ে পড়লেন।

আমি আমার বিছানায় শুতে গেলাম। কিন্তু মাথা কি রকম দপ্ দপ্ করতে লাগল। হাঁটুতে মুখ গুঁজে চুপচাপ বসে থাকলাম। কি রকম শীত শীত করতে লাগল। মনে হ'ল আমরা কত অসহায় পৃথিবীতে এত মানুষ তবু আমাদের রক্ষে করার কেউ নেই। ভয় পেয়ে মাঝে মাঝে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠতে লাগল। শিয়ালের ডাক ছোটবেলা থেকে শুনছি কিছু মনেই হয় না। কিন্তু সেদিন শিয়ালের ডাক শুনে আমার কি ভীষণ ভয় করতে লাগল। তাড়াতাড়ি কাঁথা চাদর যা ছিল তাই মুড়ি দিয়ে কুঁকড়ে পড়ে থাকলাম। আরও কিছু পরে একটু তন্দ্রার মত এসেছে। হঠাৎ বাবার

চিৎকারে ধড়মড় করে উঠে বসলাম। আবার চিৎকার করে বলে উঠলেন, "না না এ হ'তে পারে না—হতে পারে না কিছুতেই না না না।"

আমি ছুটে গিয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরে বললাম, "বাবা তুমি অমন করছ কেন? কি হতে পারে না বাবা?"

বাবা উঠে বসেছিলেন আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, "খুকি তুই এখনও ঘুমোসনি?"

"হাঁ। ঘুমিয়েছিলাম তো তোমার কথা শুনে উঠে এলাম। কি হতে পারে না বাবা।"

'ও কিছু না তুই যা ঘুমোগে'—আমি আব্দারের সুরে বললাম, "না তোমাকে বলতেই হবে। বল বলছি শিগ্‌গির নাহলে যাব না।"

'দূর বোকাটা'—বাবা একটু কেস চুপ করে থেকে বললেন, জানিস ঐ পাঠাটা ওই করিমের ছেলে হাসান গুণ্ডাটা আজ আমাকে শাসিয়েছে তোর সাথে ওর বিয়ে না দিলে আমার লাস ফেলে দেবে। যেগুলো আগে আমাদের সাথে মুখ তুলে কথা বলতে সাহস পেত না সেই জানোয়ারগুলো আমাকে ডেকে আজ শাসিয়েছে রাস্তায়। আমাদের নাকি জমি বিক্রী করে পালাতে দেবে না—যে করে হোক তোকে ওদের চাই। মুখের ওপর এই কথা বলল। আমার গায়ে যদি আগের মত জোর থাকত আর একটা কিছু অস্ত্র থাকত তাহলে আমি আজ ওদের সবকটাকে খুন করতাম ওইখানে দাঁড়িয়ে। কিন্তু আমি আজ বড় অসহায়রে। ওদের শুধু জানিয়ে আসতে পেরেছি, আমি বেঁচে থাকতে আমার মেয়ের গায়ে কেউ একটা আঁচড়ও কাটতে পারবে না শত চেষ্টা করেও।"

আমি ফুঁপিয়ে কেঁদে বললাম, "বাবা তুমি আমাকে ওদের কারও সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দাও। না হলে ওরা তোমাকে হয়ত সত্যি মেরে ফেলবে। 'না'। বাবা চিৎকার করে উঠলেন। "তার আগে প্রয়োজন হলে তোকে আমি নিজে হাতে মেরে ফেলব।" বাবার স্বরটা ভেঙ্গে এল। "তুই আমার লক্ষ্মী প্রতিমা মা বড় কষ্টের একমাত্র মেয়ে—তুই আমাকে এই কথা বলতে পারলি খুকী—ঐ জানোয়ারগুলোর হাতে তোকে আমি তুলে দেব—হা ভগবান তুমি কোথায়? আমি বলছি তুমি নেই তুমি মিথ্যে—সব মিথ্যে সব মিথ্যে।"

বাবা ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললেন।

"বাবা বাবা তোমাকে আর কোনদিন আমি একথা বলব না। তুমি চুপ কর বাবা।"—আমিও বাবার বুকে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে লাগলাম। তবুও বাবার চোখের জল থামল না। আমারও না। এই ভাবে সেই বিশ্রী রাতটা এক সময় কেটে গেল।

তখন কি জানতাম এইখান থেকেই হ'ল শুরু আমার জীবনের আসল নাটক ?

সকালবেলায় গোলামদা এল। বাবা শেষ রাত্তিরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু আমি সারারাত্রি দু চোখের পাতা বুজতে পারিনি। গোলামদা বাবাকে ডাকতেই আমি উঠে দরজা খুলে বাইরে আসতেই গোলামদা ব'লে উঠল, 'কিরে বুড়ী তুই রাত্তিরে ঘুমোসনি ?'

'না'—আস্তে বললাম 'কি করে বুঝলেন ?'

'আমি কেন—যে কেউ এখন তোর চেহারা দেখলেই বুঝতে পারবে। তুই রাত্রিতে ঘুমোসনি তো বটেই উপরন্তু আরও কি সব করেছিস।'

আমি আর থাকতে পারলাম না। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বললাম, 'আমাদের কি হবে গোলামদা।'

গোলামদা গম্ভীর ভাবে বলল "কি আবার হবে ? কিছু না। আমাদের ওপর বিশ্বাস রাখতে পারছিস না ?"

আমি কোন উত্তর দিতে পারলাম না।

তোর বাবা কোথায় ?

"ঘরে ঘুমোচ্ছেন। ডেকে দেব ?"

'না থাক' একটু থেমে বলল, "উঠলে বলে দিস আমি বারণ করে গেছি। আজ যেন বাড়ি থেকে না বের হ'ন। আর তুই একটু সাবধানে থাকিস্।" বলেই গোলামদা বেরিয়ে গেল হন হন করে।

কিন্তু নিয়তি যখন মানুষকে টানে—তখন কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। বাবাকেও বোধ হয় সেদিন ঐ নিয়তিই টেনেছিল। না হলে আমি এত বারণ করা সত্ত্বেও বিকেলের একটু আগে বেরবেন কেন ? সারাদিন গোলামদার কথা মত বাড়ি থেকে বেরোননি বাবা কিন্তু কা
ওপর এত ভাবন—বিকেলের একটু আগে বললেন,

"খুকী আমি একটু ঘুরে আসছি—তুই ঘরে খিল দিয়ে বসে থাক্।" আমি তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে বাবার হাত দুটো ধরে বললাম, 'না বাবা তুমি যেও না আমার ভীষণ ভয় করছে।' "কিছু ভয় নেই। একটু বাদেই ফিরে আসব দেখিস্। আর এভাবে ঘরে বসে থাকলে কি হবে। কালকেই আমি এই শত্রুপুরী ছেড়ে চলে যাব। রাত্তিরবেলা পারাপার করে একটা লোক। ওর সাথে একবার দেখা করে ব্যবস্থাটা পাকা করেই চলে আসব।"

তবু আমি বার বার বাবাকে যেতে বারণ করলাম।

বাবা শুনলেন না—বারাণ্ডা দিয়ে উনি যখন নেমে যাচ্ছেন তখন আমার ভেতরটা কি রকম একবার শিউরে উঠল। আমি চিৎকার করে বললাম, "বাবা তুমি যেয়ো না—আমার ভীষণ ভয় করছে।"

বাবা শুনলেন না চলে যেতে যেতে বললেন, "যা ঘরে যা আমি এখুনি আসছি।"

আমি ঘরে গিয়ে বসতেই ভয়টা বাড়তে লাগল।

বসে আছি চুপচাপ কখন বাবা ফিরে আসবেন। অনেকক্ষণ কেটে গেল বিকেল প্রায় শেষ হতে চলল তবু বাবা ফিরে এলেন না। ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। আর আমার ভেতরটায় কি রকম একটা অমঙ্গলের ভয়ে কেঁপে উঠতে লাগল। হঠাৎ নজরে পড়ল ঘরে যেখানটায় আমি লক্ষ্মীপূজো করি সেখানকার ছবিগুলোর দিকে। লক্ষ্মীঠাকুরের ছবিটার ওপরে রয়েছে শিব কালি দুর্গার তিনটে ছবি।

আমি সামনে হাঁটু গেড়ে বসে এক মনে ওদের ডাকতে লাগলাম। সন্ধ্যে হ'য়ে গেল ঘর অন্ধকার এক মনে তখনও প্রার্থনা করে চলেছি আর মনে হচ্ছে এই বুঝি বাবার গলার স্বর শুনব 'খুকী' কিন্তু কোথায় বাবা। অন্ধকারেও বুঝলাম আমার ঠোঁট শুকিয়ে উঠেছে কপালে ঘাম জমে উঠেছে। জিভটায় যেন শুকনো আঠার মত কিছু জমে উঠছে—আর তখন আমি জোরে চিৎকার করতে লাগলাম একটা স্তোত্র। যেখানকার যা ভগবানের নাম করার মত মনে ছিল তাই এলোমেলো ভাবে আউড়ে চললাম।

হঠাৎ ভীষণ চমকে উঠলাম—কান পেতে শুনলাম অনেক দূরে যেন কিসের একটা গোলমালের আওয়াজ। ভয়ে আমার শরীর যেন ঠাণ্ডা

হয়ে এল। একটু পরেই মনে হ'ল গোলমালটা যেন একটু একটু এগিয়ে আসছে। আমার গলার স্বর আটকে গেল ঘরে বসে ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগলাম।

হঠাৎ মনে হ'ল কারা যেন দৌড়ে আমাদের বাড়িতে ঢুকল। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। চাপা স্বরের ডাক উঠল।

'বুড়ী। এই বুড়ী।'

'গোলামদা'—আমি চিৎকার করে কেঁদে উঠলাম। "আমার বাবা কোথায়? আমার বাবাকে তোমরা এনে দাও গোলামদা।"

দরজার কাছ থেকে গোলামদা চাপা স্বরে বলে উঠল, "শিগ্‌গির বেরিয়ে আয় বুড়ী যদি বাঁচতে চাস—ওরা প্রায় এসে পড়েছে।"

আমি দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে শুনলাম গোলমালটা আমাদের বাড়ির একটু দূরেই এদিকে ছুটে আসছে।

শুকনো মুখে বললাম 'ওরা কারা? আমার বাবা কোথায় গোলামদা।' "পরে শুনিস—শিগ্‌গির দৌড়ো।"

গোলামদা আমার হাত ধরে আমাকে জোর করে ছুটিয়ে নিয়ে চলল বাড়ির পেছন দিক দিয়ে। বেশী দূর যাইনি হঠাৎ বাবার ওই বুক ফাটা চিৎকার শুনলাম গোলমালের মধ্যে থেকে। "খুকীরে ও খুকী তুই পালা খুকী তুই পালা। ওরা আমায় মেরে ফেলছে। ওঃ আমায় মেরে ফেললে গো।"

বাবার স্বর থেমে গেল। আর আমি অবশ হয়ে এলিয়ে পড়লাম। মুখ দিয়ে শুধু বেরোল 'ও বাবাগো' আমার আর কিছু মনে নেই। জ্ঞান ফিরেছিল তার পরের দিন পাশের গ্রামে গোলামদার বন্ধুর এক আত্মীয়ের বাড়িতে। পরের ঘটনাটুকু ওই বন্ধুর মুখ থেকেই শোনা। আমি দেখেছিলাম আমাকে উদ্ধার করার জন্যে গোলামদা একা আসেনি—অন্ততঃপক্ষে আরও সাত আটজন সঙ্গে ছিল। হয়ত যে সময় পাওয়া গিয়েছিল তাতে জোরে দৌড়ে পালান যেত। কিন্তু আমি অজ্ঞান হয়ে যাওয়াতেই ঘটল আরও বিপদ। ওরা একটু ঘাবড়ে গিয়ে সময় নিল। আর তাতেই গুণ্ডাদের একজনের টর্চের আলো এসে পড়ল আমাদের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে গোলামদা দুই বন্ধুকে আমাকে ওদের এই আত্মীয়ের বাড়িতে

পৌঁছে দিতে নির্দেশ দিয়ে বলল 'কুইক।' ওরা দুজনে আমাকে চ্যাংদোলা করে দৌড়তে লাগল। পরে অসুবিধা হওবায় এক একজন করে আমাকে কাঁধে তুলে ছুটে এসেছে ঐ কয় মাইল দূরে নিরাপদ আশ্রয়ে।

আমি বন্ধুর কথার মধ্যে কেঁদে ফেলেছিলাম—কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলাম, "আমার বাবা কি বেঁচে নেই ?"

আমার সম বয়েসি কি কিছু বড় হবে একটা মেয়ে তার মা বসেছিলেন খাটের ধারে। ওর মা আমার কপালে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলেছিলেন, "না তিনি বেঁচে নেই কাল হাসপাতালে নিয়ে যাবার পথেই মারা গেছেন।"

আমি খুব কাঁদছিলাম আর ওনারা দুজন আমাকে কত কি বলে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন। গোলামদার বন্ধু পাশে একটা চেয়ারে চুপচাপ বসেছিল।

হঠাৎ মনে হ'ল গোলামদা কোথায় ?

আমি কান্না থামিয়ে প্রশ্ন করলাম, 'গোলামদার কি হ'ল সে কোথায় ?'

বন্ধু বলল, "সময় যদিও খুব কমই ছিল তবু আমরাও জিজ্ঞেস করেছিলাম তোদের কি হবে।

গোলামের হাতে লাঠি ছিল না আমার হাত থেকে লাঠিটা টেনে নিয়ে বলল, "আমরা বাধা দেব গুণ্ডাগুলোকে।" লাঠিটা বাঁ হাতে ধরে বলল, "এই হচ্ছে প্রথম যতক্ষণ চলবে ততক্ষণ আর এই হচ্ছে শেষ।" ব'লেই পকেট থেকে একটা ধারাল মোড়া ছুরি বের করে মেলে ধরল—"হাসান তোর পকেটে বোধ হয় নেই—তবে আমি কিন্তু সবাইকে এই দুটো জিনিষই সঙ্গে নিতে বলেছিলাম—যা শিগ্‌গির চলে যা তোদের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশী।"—আমি আর আনসারি ছুটলাম তোমাকে নিয়ে। শেষ বারের মত গোলামের চোখ দুটো একবার দেখেছিলাম অন্ধকারেও যেন ধ্বক্ ধ্বক্ করে জ্বলছে। চিৎকার করে একবার আমাদের উদ্দেশ্যে বলল, "আমরা যদি কেউ মরে যাই, বাবা মাদের বলে দিস তোমাদের ছেলেরা যে মানুষ হয়ে জন্মেছিল সবার আগের মুহূর্ত পর্য্যন্ত শুধু সেইটুকু তারা ভুলতে পারেনি।" যখন আরও দূরে একটা পথের বাঁকে আমরা মিলিয়ে যাব তখন পেছন ফিরে দেখেছিলাম মাঝে মাঝে দু একটা টর্চের আলো জ্বলেই নিবে যাচ্ছে। অন্ধকার বেশ দূরেই হবে তবু মাঝে মাঝে চিৎকার গর্জন আর গালাগালির

শব্দ শুনে মনে হচ্ছিল গোলাম দা গুণ্ডাগুলোর সঙ্গে বাঘের মত লড়াই করছে। ঐ গুণ্ডাদল ছিল বাইরে থেকে ভাড়া করা পেশাদারী গুণ্ডাদল।

হাসান একটু চুপ করল মাথাটা নিচু করে আস্তে বলল, "আজ ভোরবেলায় একটু আগে খবর পেয়েছি গোলাম কেফায়েৎ, মহম্মদ তিন জনে সাংঘাতিক জখম হয়ে হাসপাতালে আর বাকী কজনে অল্প বিস্তর জখম হয়ে বাড়িতে আছে।"

আমি উত্তেজনায় বলে উঠলাম, "আমি যাব, আমি যাব একবার দেখতে।"

'না'—হাসান আস্তে বলল, "গোলাম জ্ঞান ফিরেই আমাদের বলে পাঠিয়েছে যে করেই হোক আজ রাত্রিতেই যেন তোমাকে ঠিকঠাক করে কোন ভাল আত্মীয়ের ঠিকানা দিয়ে ভালভাবে ওপারে পার করে দেবার ব্যবস্থা করি।" একটু বাদে আস্তে আস্তে আমি বিছানায় আবার এলিয়ে পড়লাম।

হাসান সত্যিই ব্যবস্থা করল সেই রাত্রিতে বর্ডার দিয়ে এপারে পালিয়ে আসতে। আমি জানিয়েছিলাম কলকাতার পাশে দমদমে আমার এক মাসীমা থাকেন সেখানেই যাব। ঠিকানা জানিনা। তবে বাড়ী চিনি। খুব ছোটবেলায় একবার গিয়েছিলাম।

হাসান বোধহয় এর কিছু শুনতে চায়নি, আনসারেরও সারাদিনে দেখা মিলল না। হাসানকে দেখে মনে হচ্ছিল ও একটু বিব্রত হয়ে পড়েছে আমাকে নিয়ে। আর তাইতে সেই রাত্রেতে সে আমাকে সঙ্গে করে নদীর ধারে নিয়ে কতকগুলো লোকের হাতে ছেড়ে দিল।

সামনে একটা ছোট নৌকো বাধা ছিল। বুঝলাম ওতে করেই ওরা আমাকে পার করবে। লোকগুলোকে পাশে ডেকে ভাড়া মিটিয়ে দিল। আর ওদের বারবার করে বাস রাস্তা বা সামনের ষ্টেশনটা চিনিয়ে দিতে বলল। তারপরে একটা ছোট হাত ব্যাগ আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, "এটা রাখ, গোলাম তোমাকে দিতে বলেছে।"

আমি ওটা নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলাম। আমার লোকগুলোকে মোটেই ভাল লাগছিল না। অন্ধকারে ওদের মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম না। আমারও যেন কি রকম ভীষণ ক্লান্তি আর অবসাদ এসে জুড়ে বসেছিল মনটায় আর

মাঝে মাঝেই শুধু বাবার সেই শেষ চিৎকার আমার কাণে এসে ঢুকছিল—তারপরেই গোলামদার কথা।

ওরা চারজন নৌকোয় গিয়ে বসল, আমাকে ডাকল এস।

আমি হাসানের কাছে এগিয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে বললাম—"আমার এদের সঙ্গে যেতে কি রকম ভয় ভয় করছে।"

হাসান একটু বিব্রত ভাবে তাড়াতাড়ি বলল, না না, এদের কোন ভয় নেই। সব আমার জানা লোক। গোলামদার কথা মনে পড়ল। ভাবলাম সে থাকলে আমাকে এত সহজে নিশ্চয়ই এদের হাতে ছেড়ে দিতে পারত না। আমি হাসানের দিকে একবার চেয়ে আস্তে আস্তে গিয়ে নৌকোয় উঠলাম।

নৌকোটা ছেড়ে দিতেই হাসান চলে গেল। আর আমি নৌকোর মধ্যে বসে আকাশ পাতাল চিন্তা করতে লাগলাম।

ঐ যে একটু দূরেই আমার জন্মভূমির রেখা আর কিছু দূরেই আমাদের সেই গ্রাম। ছোটবেলা থেকে যে মাটির বুকে আমরা হেসে খেলে বড় হয়েছি। আমাদের সেই ছোট আটচালা ঘরখানা, যার পরিস্কার উঠোনটায় মাত্র কয়েক বছর আগেও আমি আর দাদা একৃকা দোক্কা খেলতাম। পাশে একটা বুড়ো আমড়া গাছ ছিল। গত বছর সেটা মরে গেছে। তখন গাছে আমড়া পেকে থাকত। মাঝে মাঝে এক আধটা পড়ত, কিন্তু অধিকাংশই পেতাম না। আশেপাশের ছোট ছেলে মেয়েগুলো কুড়িয়ে নিয়ে যেত। গাছটায় ওঠার দু-একদিন চেষ্টা করেছি পারিনি। দাদাও পারেনি। দাদা এমনিতেই একটু রোগা আর রুগ্ন ছিল। মনে আছে একদিন আমি আর দাদা একৃকা দোক্কা খেলার একটা ঘর কেনা নিয়ে ঝগড়া আরম্ভ করে দিয়েছি। কিছুতেই মীমাংসা হচ্ছে না, তখন দাদা রেগে বলে উঠল তাচ্ছিল্যভাবে, তুই ত মেয়ে। তোর সাথে খেলাই আমার ভুল হয়েছে। তোরা পারিস শুধু ঝগড়া করতে। তোদের ক্ষমতা ঐ পর্যন্ত।

আমিও বলে উঠলাম রেগে ওঃ, তুই তো খুব বড় পুরুষ ছেলে—ওঠ না দেখি ওই আমড়া গাছটায়।

দাদা মুখ বেঁকিয়ে বলল যা যা, চেষ্টা করলে এখুনি উঠতে পারি ওটা আবার একটা গাছ নাকি?

মাথা বেঁকিয়ে বললাম, জানা আছে তোর কত মুরোদ! ওঠ না দেখি।

দাদা গাছটার দিকে বড় বড় চোখে তাকিয়ে বলল উঠব?

"হ্যাঁ ওঠ! তুই পারবি না।"

"পারব না? আচ্ছা দেখ পারি কিনা!" বলেই দাদা ছুটে গেল গাছটার দিকে।

ওঃ গাছটায় ওঠার জন্যে দাদার সেকি প্রাণপণ চেষ্টা সেদিন। তলার লম্বা অংশটায় খানিক দূর ওঠে আবার পড়ে যায়। গা হাত পা ছড়ে গেল, সেদিকে খেয়ালই নেই! মুখ চোখ লাল হয়ে ঘাম ঝরতে লাগল তবু দাদার কি আপ্রাণ চেষ্টা।

শেষকালে আমার কষ্ট হতে লাগল, ছুটে গিয়ে দাদাকে ধরে টানতে লাগলাম।

ছেড়ে দে। এক ঝটকায় আমাকে ছাড়িয়ে দিল।

আমি জোরে বলে উঠলাম দাদা তুই পারবি—আমি বলছি তুই ও গাছে উঠতে পারবি।

না—আমি উঠবই। দাদা ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলল।

কিন্তু আমিও দাদাকে ছাড়লাম না। দুটো ঘুষি আর থাপ্পড়ে আমি কেঁদে ফেললাম, তবু শেষ পর্যন্ত যখন ছাড়লাম না, তমন দাদা হাঁফাতে হাঁফাতে ফিরে চলল।

অথচ এই দাদা আমাকে কি ভীষণ ভালবাসত।

আর বাবা—ওঃ আমার দুঃখী বাবা, পরশু রাত্রিবেলায় কথা বলতে বলতে কত চোখের জল গড়িয়ে পড়ছিল। আমি আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিয়েছিলাম বারবার।

আর আমার চোখের জল—

অন্ধকারেও বুঝতে পারলাম আমার চোখের জলে বুকের কাপড় ব্লাউজ সব ভিজে উঠেছে।

নৌকোটা দুলে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে ফস্ করে দেশালাই কাঠি জ্বলে উঠল বিড়ি ধরাচ্ছে একজন।

আমি ভীষণ চমকে উঠলাম। আবার দেশলাই কাঠি জ্বলে উঠল।

এবারও সেই বিড়ি, কিন্তু আমি পেছনের এক জোড়া চোখ বাদে সামনের তিন জোড়া চোখ দেখতে পাচ্ছিলাম। সেগুলো বিড়ি ধরানোর আছিলায় আমাকে কুৎসিৎ জলজলে চোখে দেখছে।

দু-জনের মুখের দুটো বিড়ি ধরানোর জন্যে ওরা দুটো কাঠি খরচ করল, কাঠির আলোয় আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করার জন্যে।

আমার চোখের জল পড়া বন্ধ হয়ে গেল। মনে হল ভীষণ শীত করছে। ভেতরটায় কি রকম গুড় গুড় শব্দ হতে লাগল। বুঝতে পারলাম আমার বাঁচার সব রাস্তা বন্ধ। ওপারের গুণ্ডাদের চোখে যে কামার্ত পশুর ছায়া ফুটে উঠেছিল। এদের চোখেও সেই একই ছায়া আমি লক্ষ্য করলাম এ কাঠির আলোয়!

একবার ভাবলাম নদীতে ঝাঁপ দিই। কিন্তু তাহলেও এদের হাত থেকে নিস্তার নেই বুঝলাম এরা জলের পোকা। ঠিক তুলে আনবে।

—আবার আমার ঠোঁট শুকিয়ে উঠল। কপাল দিয়ে ঘাম ঝরতে লাগল। তবু আমি চুপচাপ বসে থাকলাম।

পাড়ে এসে নৌকোটা লাগল। আমি পাড়ে উঠলাম আর সঙ্গে সঙ্গে ওদের তিনজনও আমার সঙ্গে উঠে এসে আমার পাশে দাঁড়াল—আর একজনে নৌকোটা কিছুদূর বেয়ে নিয়ে একটা বাঁকের মুখের দিকে চলল!

আমি শুকনো মুখে বললাম,"আমাকে বাস রাস্তার দিকটা বলে দিন আমি চলে যাই।"

একজন গলা খাঁকারি দিয়ে বলে উঠল, বাস রাস্তা এখান থেকে অনেক দূর, রেল ষ্টেশনও অনেক দূর। এত রাত্রিতে বাস ট্রেন সব বন্ধ। কাল সকালে যেও। রাত্তিরটা এখানে কোথাও থেকে যাও।"

"না, রাস্তা কোন দিকে বলে দিন, আমি চলে যাই।"

ওরা পরস্পরের দিকে তাকাল বুঝলাম। একজন বলল, "ঠিক আছে দেখিয়ে দিচ্ছি।"

এর মধ্যে অন্য লোকটা নৌকোটা কোথায় রেখে কাছাকাছি এসে বসে পড়ল। কাছে এসেই বলল আদেশের সুরে, 'যা, রাস্তাটা দেখিয়ে দিয়ে আয় তোরা।'

ওরা তিনজনে নদীর ধার দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল আমাকে। আর অন্য

লোকটা একজনের কানে কানে কি বলে সামনের একটা ভেড়ীর ওপর দিয়ে চলে গেল।

আমাকেও ওরা নদীর ধারের একটা ভেড়ীর ওপর দিয়ে নিয়ে চলল। খানিকটা যাওয়ার পরে বললাম—

এদিকে কিসের রাস্তা ?

একজন তাড়াতাড়ি বলল, 'ষ্টেশনের রাস্তা।'

আমি দাঁড়িয়ে পড়ে বললাম,

"ঠিক আছে। আপনারা আর কেন কষ্ট করছেন ? আমি দেখে নেবখন।"

"না না, তাই কি হয়। এত রাত্তিরে তুমি একটা একলা মেয়েমানুষ যাচ্ছ ছেড়ে দিতে পারি ? আমাদের ওপর একটা দায়িত্ব দেওয়া আছে ত।"

কি একটা বলতে গেলাম। কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরুল না। আশে-পাশে তাকিয়ে দেখলাম, একদিকে একটা খাল তার পরে ক্ষেত আর এ পাশেও ধান ক্ষেত। জন মানুষের কোন নাম গন্ধ নেই। চিৎকার করেও কোন লাভ নেই বুঝলাম। অগত্যা মন্ত্রমুগ্ধের মত হাঁটতে লাগলাম।

কোথায় ষ্টেশন—একটা ফাঁকা বিলের ধারে একটা ছোট চালা ঘরের সামনে আমাকে দাঁড় করাল। আমি সামনে হাঁটতে যাচ্ছিলাম একজন সামনে এসে দাঁড়াল পথ আগলে। আর একজন দরজায় একটা ধাক্কা মারতেই দরজাটা খুলে গেল।

আমার জিব শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। কোনমতে বললাম, 'এখানে কি ?'

জোরে স্বর শুনলাম, "ভেতরে ঢোক।"

কেন ?

কেন আবার। বিকৃত স্বরে একজন বলে উঠল, ঢোক ভেতরে। আর সঙ্গে সঙ্গে আমার হাত ধরে একটান মেরে এক ধাক্কায় ঘরের ভেতরে ঢুকিয়ে দিল।

আমি চিৎকার করে কেঁদে উঠে বললাম, "আমাকে আপনারা কি করতে চান ?"

"বিশেষ কিছু না, শুধু আজ রাত্রিটা তোমাকে দিয়ে আমাদের একটু গা গরম করাতে চাই।" বলেই খিক খিক করে হেসে উঠল।

ওরা ততক্ষণে ঘরে ঢুকে পড়েছে। আমি ছুটে গিয়ে একজনের পা জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললাম। আমায় বাঁচান—আমায় বাঁচান দয়া করে। আমার কাছে যা আছে সব আপনাদের দিয়ে দিচ্ছি।

হাঃ হাঃ করে হেসে উঠে বলল, 'দেখি কি আছে।" পা দুটো ছাড়িয়ে নিয়ে হাত বাড়াল।

আমি বুকের ভেতর থেকে গোলামদার দেওয়া ব্যাগটা বের করে ওর হাতে দিলাম।

একজন দেশলাই জ্বালিয়ে একটা হ্যারিকেন বের করে ধরাল। আমি ততক্ষণে কানের দুটো সরু সরু সোনার রিং আর হাতের দু-গাছি সরু সোনার চুড়ি খুলে ফেলেছি।

সেগুলো হাতের ওপর রেখে ওদের দিকে বাড়িয়ে দিলাম। অন্য আর একজন সেগুলো নিয়ে হাতে রেখে দিল।

ব্যাগে কি আছে আমি তখনও জানতাম না। হ্যারিকেনের আলোয় টাকা পয়সা গুনে আবার ব্যাগে রেখে দিল। বলল—বারো টাকা আট আনা।

আবার বলল, 'আর কিছু নেই?'

'না।'

"ঠিক আছে এই ব্যাগটা আর ওগুলো ওপাশে রেখে দে।"

আমি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটার পা দুটো আবার জড়িয়ে ধরে বললাম, "দয়া করে আমায় ছেড়ে দিন।"

কোন উত্তর দিল না। ওর গায়ে একটা গাঢ় নীল রঙের জামা ছিল। পরণে খাটো ধুতি। জামার পকেট থেকে একটা বিড়ি বের করে ধরিয়ে বলল, "আমাদের ছেড়ে দেবার ক্ষমতা নেই। বস গিয়ে খাটের ওপর।"

আমি ওর পায়ে মাথা ঠুকতে ঠুকতে বললাম, "আপনি আমার দাদা। আমি আপনার বোন। এইটুকু দয়া আমায় করুন।" ও পা ছাড়িয়ে ঝট করে সরে দাঁড়াল। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আগের লোকটা আরও তিন চারজনকে নিয়ে ঘরে ঢুকল। লোকটার মুখ দেখলাম বয়সে প্রায় আমার বাবার মতনই হবে। চোখ দুটো দিয়ে মাটিতে পড়ে থাকা আমার দিকে একবার কুৎসিৎ ভাবে তাকাল। তবু আমি মরিয়া হয়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে

পড়লাম ওর পায়ে। কাঁদতে কাঁদতে বললাম, "আমায় ছেড়ে দিন। আমায় আপনারা ছেড়ে দিন। আপনি আমার বাবা। আমার বাবাকে কত কষ্ট দিয়ে ওপারে গুণ্ডারা মেরে ফেলেছে। আপনাকে আমি বাবা বলছি।" কাঁদতে কাঁদতে আরও কত কি বলতে যাচ্ছিলাম। হটাৎ এক লাথিতে আমি ছিটকে পড়লাম দূরে। "ছাড় শালি বাবা মারাচ্ছে। শালা জন্মে কোনদিন আমি মেয়ে বিয়োলাম না। বাবা—"মুখ খিঁচিয়ে একটা কাঁচা খিস্তি ঝেড়ে বলল, "আর যদি ওসব বলবি তো বলে দিচ্ছি শালা, মেরে গাংয়ের জলে ভাসিয়ে দেব।"

হঠাৎ বুড়ী চুপ করে গেল। আমি দেখলাম ওর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। আমারও কি রকম যেন কষ্ট হতে লাগল ওকে দেখে। গলায় একটু ব্যথা ব্যথা মত মনে হ'ল। বুঝলাম চোখ দিয়ে জল না পড়লেও ছল ছল করে উঠেছে। কিন্তু কোন প্রশ্ন করলাম না।

শাড়ীর আঁচল দিয়ে চোখ দুটো মুছে একটু ভাঙা ভাঙা স্বরে বলল, "জান সেদিন আমার আকুতি মিনতি আর কান্না দেখে বোধ হয় পাষাণও গলে যেত। কিন্তু ঐ জন্তুগুলোর মনে একটু দাগও পড়ল না। ওরা তখন একটা সুন্দর কচি মেয়ের মাংসের নেশায় পুরো জন্তু তৈরী হয়ে গেছে। বুঝতে পারলাম এদের কাছে আর কোন অনুনয় আবেদন করার চেয়ে ঘরের দেয়াল বা খাটের সঙ্গে করাও ভাল। আমার কান্না বন্ধ হয়ে গেল।"

আমি বুড়ীকে বললাম, "তোমার বয়স কত?"

"এই সাড়ে পনের কি ষোল হবে।"

বুড়ী একটু থেমে আরম্ভ করল আবার সেই রাত্রির নরক দৃশ্য।

ঘরে একটা খালি সরু তক্তপোষ পড়ে ছিল এক পাশে। আমি আস্তে আস্তে গিয়ে তার ওপর বসলাম। আর জানোয়ারগুলোকে লক্ষ্য করতে লাগলাম। দরজা বন্ধ করে সাত আটজন ওর কাছে বসে তখন তাড়ি গিলছিল। আমার চোখ দুটো দপ দপ করে জ্বলতে লাগল। মাথাটা মনে হ'ল আগুনের মত গরম হয়ে উঠেছে। আমি সবচেয়ে বেশী লক্ষ্য করছিলাম ওদের দলের সর্দার বুড়ো জানোয়ারটাকে। গোটা দুই ছেলে ছিল

উনিশ কি কুড়ি বছরের হবে। ওগুলোকে মনে হ'ল নতুন আমদানি। কিছু টাকা বোধ হয় ওদের কাছ থেকে নিয়ে ওদের হাজির করেছে।

তাড়ির পচা গন্ধে আমার গা গুলিয়ে উঠতে লাগল। বমি ঠেলে আসতে লাগল।

ভাবলাম এখন একমাত্র বাঁচার উপায় বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করা। কিন্তু কোথায় বিষ। আশে পাশে কোথাও একটা লোহার অস্ত্রশস্ত্রও নেই।

তাড়ি গিলতে গিলতে বিভৎস তেলা চকচকে মুখে মাঝে মাঝে সবাই জুলজুলে চোখে আমাকে দেখছিল। বুড়োটার দৃষ্টিটা লাগছিল সবচেয়ে কুৎসিৎ।

আমিও একদৃষ্টে ওকে দেখতে লাগলাম আর ভেতরে ভেতরে একটা হিংস্র চিন্তা পাক খেয়ে উঠতে লাগল।

একটু বাদে দেখি দরজা খুলে একজন বাইরে বেরল। বমির শব্দ শুনলাম। বোধ হয় তাড়ি খাওয়া অভ্যাস নেই। ওরা একটু আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে মনে হ'ল। দুজনে ঘরে বসে অজস্র কাঁচা খিস্তী করে যাচ্ছিল যেটা বাইরে বমি করছিল সেটাকে উদ্দেশ্য করে।

আমি আস্তে আস্তে খাট থেকে উঠে ধীরে ধীরে দরজার দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম। একটা বুদ্ধি এল মাথায়। আস্তে নিচু হয়ে তলার সায়াটা গুটিয়ে কোমরের কাছে গুঁজে দিলাম। তারপর আস্তে আস্তে আবার এগিয়ে সেই খোলা দরজাটার কাছাকাছি এসে পড়েছি। হঠাৎ বুড়ো জানোয়ারটা এক লাফে এসে আমার ঘাড়টা ধরল। চিৎকার করে উঠল—শীগ্গির ধর। আমি ছুটবার আগেই দু তিনজনে এসে ঘাড়ের ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমি নিচে পড়ে গেলাম। 'শালা ফসকিয়ে ছিল আর কি মালটা।'

দুজনে আমার দুটো হাত ধরে টেনে দাঁড় করিয়ে দিল। বুড়োটা বলল, "তোরা দুজনে হাত দুটো টেনে ধরে থাক আমি দেখছি।"

ওরা আমার দুটো হাত দু পাশে টেনে দাঁড় করিয়ে রাখল। আর বুড়ো হারিকেনটা নিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে আমার মুখের সামনে তুলে ধরল।

'বাঃ বাঃ চমৎকার—একেবারে যেন শালা বেহেস্তের হুরী।' আস্তে আস্তে

আলোটা নেমে এল আমার বুকের কাছে। বুড়োটার চোখ জ্বলতে লাগল বুকের দিকে তাকিয়ে।

ডান হাতে আলোটা ধরা ছিল। বাঁ হাতটা তুলে আমার আলতো ভাবে পেঁচানো শাড়ীটায় সেই হাত দিয়েছে আমি লক্ষ্য করলাম ডান হাতটা ঝুলে পড়েছে আর সঙ্গে সঙ্গে এক ঝটকায় একটু পেছিয়ে আসতেই ওর আলো শুদ্ধ ডান হাতটাও একটু নেমে ওর পেটের কাছাকাছি চলে এল আর সঙ্গে সঙ্গে প্রাণপণ শক্তিতে হারিকেনটার সামনের নিচেটাই মারলাম এক লাথি।

সঙ্গে সঙ্গে ঘরে দক্ষযজ্ঞ বেধে গেল।

'ওরে বাবারে বাবারে মরে গেলাম মরে গেলাম।' বুড়োটা মাটিতে চিৎ হয়ে পড়ে চিৎকার করতে লাগল।

আমি কিন্তু পালাতে পারলাম না। অন্ধকারে একজন চিৎকার করে বলল, "ধরে রাখিস।" কিন্তু তার বলার আগেই ওরা দুজনে দু হাত ধরে প্রাণপণে টান দিয়ে চলেছে। আমি কাতরাতে লাগলাম। বুড়োটা নিচে পড়ে কাতরাতে লাগল।

অন্ধকারে কে একটা লাফ দিয়ে দরজার সামনে গিয়ে বলল শালা খুনী মেয়ে ধরে এনেছিস—এসব খুন খারাবির মধ্যে আমি নেই। আমি ভাগছি বলেই খোলা দরজা দিয়ে সে চোঁচা দৌড় দিল।

ফস্ করে একজন দেশলাই কাঠি জ্বালাল। আর সঙ্গে সঙ্গে এক বিভৎস দৃশ্য সামনে ফুটে উঠল। বুড়োটার বুকটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। দু তিনটে বড় বড় কাঁচের টুকরো গেঁথে রয়েছে সেখানে। দেখলাম একটা বড় কাঁচের টুকরো বুড়োটার মুখের নিচে গেঁথে রয়েছে সেখান থেকেও অজস্র রক্ত পড়ছে।

হারিকেনটা ছিটকে পড়ে রয়েছে কিছু দুরে।

কাঠি নিবে গেল।

কে একজন বলল 'মোমবাতি আছে ?'

"না রে—কি করব এখন।"

"কি করব আর—চল ধরাধরি করে বাড়ি দিয়ে আসি। বলবখন নৌকো থেকে হারিকেন নিয়ে নামতে গিয়ে হারিকেনের ওপর পড়ে গেছে।"

"আর এটাকে?'—আমাকে ধরে থাকা দুজনের একজন বলে উঠল। "ওটারে এক কাজ কর—জামা কাপড় খুলে নিয়ে গাঙে আচ্ছা করে চুবিয়ে জল খাইয়ে দে।"

যন্ত্রণায় আমার গলা দিয়ে শুধু একটানা একটা শব্দ বেরতে লাগল। বুড়োটা তখনও ছটফট করছে বুঝতে পারলাম। দুজনে বুড়োটাকে চ্যাংদোলা করে বের করে নিয়ে গেল।

যেতে যেতে ওদের কথা কানে গেল।

"এখন কিন্তু হাসপাতালে নিয়ে গেলে ভাল হ'ত।"

অপরজন খিঁচিয়ে উঠল—"তুই একটা আস্ত গাড়ল পাঁঠা।

হাসপাতালে নিয়ে গেলে কত কি বলতে হবে জানিস। আমাদের সবাইকে ভাল রকম চেনে এ তল্লাটে। শেষকালে কি বলতে কি বেধে যাবে খেয়াল রাখিস? তাছাড়া এত রাত্তিরে হাসপাতালে···হুঁঃ যা বলছি তাই কর। এলাম এক কাজে বাঁধল এক ফ্যাকড়া।" ওরা চলে গেল।

ঘরে তখনও বোধ হয় চার পাঁচজন ছিল।

আমাকে এবার টেনে নিয়ে খাটের ওপর ফেলল। আমি লাথি ছুঁড়তে লাগলাম। চিৎকার করতে লাগলাম। তবু অন্য একজনে এসে আমার শরীরের সমস্ত কাপড় জামা টেনে ছিঁড়ে খুলে ফেলল। আমার লাথি লাগল কোন একজনের মুখে। সে পা দুটো চেপে ধরল। মুখের মধ্যে ঠেসে কাপড় ঢুকিয়ে দিল। উঃ কি লজ্জা সেদিন আমার। হাত দুটো টেনে কাপড় দিয়ে বেঁধে দিল। তখনও আমি কুঁকড়ে যাচ্ছি। ওরা আস্তে আস্তে নিজেদের মধ্যে কথা বলা শেষ করল। একটু পরেই একটা পশু চেপে বসল আমার শরীরে। উঃ কি যন্ত্রণা বুক থেকে আরম্ভ করে মুখ। তারপরে সমস্ত শরীরের মাংস যেন ছিঁড়ে নিতে লাগল। আস্তে আস্তে শরীর অবশ হ'য়ে পড়ল।

তবু মনে আছে আমার ওপর থেকে দুজন সরে গেল। তখনও আমার জ্ঞান ছিল। তৃতীয় জন ওঠার কিছুক্ষণ পরে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম।

জ্ঞান ফিরল তার পরের দিন। খড়ের চালের ফাঁক দিয়ে রোদ্দুর

এসে পড়েছিল আমার মুখে। ঘুমটা ভেঙে গেল। কিন্তু প্রথমে কিছুই মনে করতে পারলাম না।

দেখলাম আমার শাড়ীটা শরীরের ওপর টেনে দেওয়া রয়েছে। উঠে বসার চেষ্টা করলাম। উঃ শরীরে কি অসহ্য ব্যথা। তবু অনেক কষ্টে উঠে বসলাম আর সঙ্গে সঙ্গে গত রাত্রির সব ঘটনা ছবির মত চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল। মনে হ'ল কি সাংঘাতিক এক দুঃস্বপ্নে কেটে গেছে এই কটা দিন। সমস্ত ঘটনা এক এক করে মনে পড়তে লাগল। আর মাথাটা যন্ত্রণায় দপ দপ করতে লাগল। আবার শুয়ে পড়লাম। মনে হ'তে লাগল আমার নারী জীবনের সমস্ত স্বপ্ন, আশা, আকাঙ্খা যেন শেষ হয়ে গিয়েছে। চোখের সামনে সব শুধু যেন অন্ধকার কি ভীষণ ফাঁকা মনে হতে লাগল এই পৃথিবীটাকে।

কতক্ষণ পড়েছিলাম মনে নেই। এক সময় আবার উঠলাম।

চেয়ে দেখলাম ঘরের এদিক ওদিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে আমার ছেঁড়া জামা কাপড় সেগুলোই পরে নিলাম।

হঠাৎ ঘরের কোণটায় নজর পড়ল। একটু আশ্চর্য্য হয়ে এগিয়ে যেতেই নজরে পড়ল কালকে আমার কান হাত থেকে খুলে দেওয়া গয়নাগুলো তেমনিই পড়ে আছে। পাশে পড়ে রয়েছে গোলামদার দেওয়া ব্যাগটা। খুলে দেখলাম বারো টাকা আট আনাই আছে।

ওগুলো হাতে নিয়ে চিন্তা করলাম। গত রাত্রিতে এইগুলোর বদলে আমি শুধু আমার নারীত্বকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম। ওরা আমাকে এই ভিক্ষেটুকু দেয়নি। কেড়ে নিয়েছে জোর করে আমার নারী জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তাই এগুলোর দিকে আর নজরই দেয়নি।

আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে দেখলাম দু পাশের ধান ক্ষেতে কত রোদ্দুর ছিটিয়ে পড়েছে। আমার শরীরও রোদ্দুরের আলোয় যেন ধুয়ে যেতে লাগল। অবাক হয়ে সূর্য্যের দিকে তাকিয়ে হাঁটতে লাগলাম একটু দূরে বয়ে চলা ইছামতীর ঢালু তীরের দিকে। সমস্ত শরীরে আমার কি রকম কাঁটা দিয়ে উঠতে লাগল। কি সুন্দর লাগতে লাগল। সূর্য্যকে বোধ হয় কোনদিন এত ভালবাসতে পারিনি। সূর্য্যের দিকে তাকিয়ে বার বার প্রণাম করলাম। বাবার মুখে শোনা সূর্যাস্তবের দুটো লাইন

কখন আপন মনে আমি আবৃত্তি করে চলেছি। শরীরের সমস্ত গ্লানি যেন ধুয়ে ধুয়ে পড়তে লাগল। সামনে তাকিয়ে মনে হ'ল শান্ত গভীর ইছামতী আমাকে ডাক দিচ্ছে—শুধু ডাক দিচ্ছে। বলছে হেসে হেসে, "চলে আয়—ওরে চলে আয় আমার বুকে। ঐ নিষ্ঠুর পৃথিবীতে তোর আর কিছু চাইবার নেই রে—চলে আয় আমার শান্ত গভীর বুকে—দেখ্ কত শান্তি কত তৃপ্তি।" আমার পায়ের কাছে তখন নদীর ছোঁয়া পাচ্ছি গভীর ভাবে সে শুধু হাতছানি দিচ্ছে। আমি আর থাকতে পারলাম না। ঝাঁপ দিলাম নদীতে।

বুড়ী একটু চুপ করে একটু পরে বিড় বিড় করে অনেকটা অপন মনেই যেন বলে উঠল। তবু আমি পারলাম না সেদিন আমার এই কলঙ্কময় শরীরটাকে শেষ করে ফেলতে। আমি সেদিন মন প্রাণ দিয়ে চেয়েছিলাম এই পৃথিবীকে বিদায় জানাতে। কিন্তু তবু আমাকে আবার ফিরে আসতে হ'ল তোমাদের এই পচা নিষ্ঠুর সমাজে এই শেষটুকু দেখবার জন্যেই বোধ হয় ওরা আমাকে মরতে দিল না।

আমার তখন কিছুই খেয়াল ছিল না। কত বেলা হ'ল নদীর ধারে অন্য লোক আমাকে দেখছে কি না। তখন শুধু একটা নেশার মত এগিয়ে যাচ্ছিলাম নদীর দিকে। কিন্তু আমাকে একটু দূর থেকে একজন না দু তিন জনে লক্ষ্য করছিল। আমাকে দেখতে পেয়েই ওদের সন্দেহ হয়েছিল। কারণ আমার চেহারা মোটেই স্বাভাবিক দেখাচ্ছিল না। তার ওপর আকাশের দিকে চেয়ে নদীর দিকে হেঁটে যাওয়া দেখেই ওরা বুঝেছিল আমার মতলব ভাল নয়।

এসব অবশ্য পরে ওদের মুখ থেকেই শোনা! ওরা বলেছিল। আমি ঝাঁপিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওরাও ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল জলে। তারপরে অজ্ঞান অবস্থায় আমাকে তুলে এনে এক বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল। আমার যখন জ্ঞান ফিরে এল দেখলাম একজন বয়স্ক মহিলা আমার সামনে বিছানার পাশে বসে পাখার বাতাস করছেন। আমি চোখ মেললাম। দেখতে পেয়ে তিনি ভেতরে গিয়ে একটু বাদে এক বাটি গরম দুধ এনে খেতে দিলেন। আমি নিঃশব্দে খেয়ে নিলাম দুধটা।

চেয়ে দেখলাম সেটা একটা ছোট্ট চালা ঘর। একটু বাদে আর একজন বৃদ্ধ লোক এসে ঘরে ঢুকলেন।

আমার খাটের পাশে বসলেন। একটু পরে সেই বয়স্ক মহিলা সামনের একটা তাক থেকে পেড়ে আনলেন আমার দুগাছি চুড়ি কানের দুটো রিং আর ব্যাগটা। আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলাম। বৃদ্ধ জানালেন জল থেকে তোলার সময়েও ওগুলো আমার মুঠোর মধ্যে ধরা ছিল।

আমার উদ্ধারকারীদের মধ্যে ওই বৃদ্ধ ছিলেন একজন।

বৃদ্ধের স্ত্রী সেদিন আমাকে কত সান্তনা দিয়েছিলেন।

কানের রিং হাতের চুড়ী নিজে কত যত্ন করে আবার আমাকে পরিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "ছিঃ মা আর কোনদিন মনে এরকম খারাপ চিন্তা এনো না। কত কষ্ট করে মানব জন্ম পেতে হয়। আশী বার অন্য জন্ম নিলে তবে মানব জন্ম পেতে হয়। এ হ'ল শ্রেষ্ঠ জন্ম। এমন লক্ষ্মী প্রতিমার মত কচি মেয়ে তুমি এভাবে জীবন শেষ করতে আছে? এ চিন্তা করাও পাপ। আত্মহত্যা যে করে তার মত পাপী আর কেউ নেই এ পৃথিবীতে এইটুকু সব সময় মনে রেখো।"

আমি ফ্যাল ফ্যাল করে শুধু ওনার মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। কিছু বলার ইচ্ছে আর ছিল না। তবু সেদিন ওনাদের বলতে হয়েছিল সব ঘটনা। শুনতে শুনতে ওনারা কি রকম পাথরের মূর্তির মত হ'য়ে গিয়েছিলেন। আমার আর তখন লজ্জা ঘেন্নার বালাই ছিল না। সব খুলে বলতে বলতে সন্ধ্যে হ'য়ে গেল। আর তখনই বাইরে থেকে একটা হুঙ্কার শোনা গেল 'অবিনাশ।'

আগেই শুনেছিলাম বৃদ্ধ কোন এক জমিতে চাষবাস করে সংসার চালান। হুঙ্কার শুনেই বৃদ্ধ একটু থতমত খেয়ে গেলেন তাড়াতাড়ি বিড় বিড় করে বললেন, 'এই রেঃ, সেরেছে। গোবিন্দ মিত্তির এসে হাজির।' ঘরে থেকে বেরিয়ে একটু যেতেই জোরালো কটু ভাষণে আমার ভেতরে কি রকম যেন হতে লাগল।

"এই গ্রামে আমাদের বুকে বসে তোর এত সাহস।"

"কি দোষ করেছি আমি।" বৃদ্ধ মিউ মিউ করে উত্তর দিলেন।

আবার হুঙ্কার শোনা গেল।

"আবার বড় মুখ করে বলছিস্ কি দোষ করেছি? একটা নষ্ট চরিত্রের মেয়ে যাকে নিয়ে সারা গ্রামে ঢি ঢি পড়ে গেছে তাকে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়েছিস্? তুই একটা বুড়ো তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে। ফষ্টিনষ্টি করছিস বুড়ীর সামনে?"

বৃদ্ধ এত অপমানেও জোরে কথা বলতে পারল না। শুধু বলল সকরুণ ভাবে, "এ আপনি কি বলছেন। আমি ফষ্টিনষ্টি করতে যাব কেন। বাড়িতে একটু আশ্রয় দিয়েছি শুধু। তাছাড়া ও নষ্ট চরিত্রের মেয়ে না। ওকে নষ্ট করেছে বদমাইসগুলো। ওর জীবনটা খুব দুঃখের ও বড় অভাগী।"

'অভাগী?' হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ করে হেসে উঠল গোবিন্দ মিত্তির, "সাধে কি আর বলে মূর্খের অশেষ দোষ! ওর কথা শুনে বলছিস তো? ভাল করে খোঁজ নিয়ে দেখগে যা। কোথাকার কোন পেশাদারী বেশ্যা ছিল।"

'না।' আমি একটা ছোট্ট আর্তনাদ করে উঠে একলাফে দাঁড়িয়ে পড়ে কাঁপতে লাগলাম। বৃদ্ধা এসে আমাকে ধরলেন। বাইরে তখন বৃদ্ধ অবিনাশ বলে চলেছে, "এসব আপনি ঠিক বলছেন না মিত্তির বাবু ও আত্মহত্যা করতে..."

'থাম থাম।' গোবিন্দ মিত্তির মাঝ পথে থামিয়ে দিয়ে বলল। "মূর্খ চাষা লোকে কি আর সাধে বলে— কারণ আছে। সত্যিই কারণ আছে। ওরে! যাদের সত্যিকারের আত্মহত্যা করার ইচ্ছে থাকে তারা এক গাদা লোককে দেখিয়ে আত্মহত্যা করতে যায় না। যা সত্যি তাই বলছি শোন্। যেখানে ছিল সেখানকার বাজার হয়ত মন্দা। তাই এখানে এসে এই সব ছলা কলা করে।"

আমি আর সহ্য করতে পারলাম না। এক ঝটকায় বৃদ্ধার হাত ছাড়িয়ে ছুটে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে গোবিন্দ মিত্তিরের পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে হাত জোড় করে বললাম,

"আপনার দুটি পায়ে পড়ছি। আপনি আর বলবেন না। আর কিছু বলবেন না। আমি এ বাড়ী ছেড়ে এক্ষুণি চলে যাচ্ছি।"

গোবিন্দ মিত্তির আমার দিকে আড়চোখে দেখে দু পা পেছিয়ে গিয়ে বলল, "হুঁঃ, থিয়েটার তোরা বেশ ভালই করতে পারিস্ দেখছি।"

আমি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললাম, "থিয়েটার আমি কোনদিন করিনি।" গোবিন্দ মিত্তির আমার এই হঠাৎ পরিবর্তন দেখে একটু বোধ হয় থতমত খেয়ে গেল। একটু থেমে মুখ ভেংচে বলল, "সে আমার ভাল জানা আছে। হ্যাঁ, শোন্ অবিনাশ।"

আমি বাধা দিয়ে বললাম, "ওনাকে আর কিছু বলতে হবে না। ওনারও আর কিছু বলার দরকার নেই। যা বলার আমি বলব।"

গোবিন্দ মিত্তির খিঁচিয়ে উঠল, "তুই আবার কি বলবি ?"

গম্ভীর ভাবে বললাম, "আপনার শরীরে মানুষের রক্ত আছে কি না ?"

'কি বললি ?' গোবিন্দ মিত্তির চিৎকার করে উঠল।

এক পা এগিয়ে বললাম, "তোমার চেয়ে বনের জন্তুদের রক্ত আর মন অনেক ভাল।"

গোবিন্দ মিত্তিরের বিরাট শরীরটা একবার চিংড়ি মাছের মত লাফিয়ে উঠল। তারপর গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল, "এত আস্পর্ধা তোর ? হতভাগী বেশ্যা আমি কে জানিস ?"

"চিনতাম না। একটু আগে চিনলাম।"

"মারতে মারতে তোর ছাল ছাড়িয়ে এই গ্রাম থেকে এক্ষুণি তাড়াব।"

"তাড়াও দেখি তোমাদের কত ক্ষমতা। নিয়ে এস তোমাদের বীরপুরুষদের আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি।"

"গোবিন্দ মিত্তির লাফাতে লাফাতে পেছু হটে যেতে যেতে বলল আঙুল দিয়ে দেখিয়ে ঠিক আছে তুই ওখানে দাঁড়িয়ে থাক্। তোকে মজা দেখাচ্ছি একটু বাদেই।"

একটু থেমে দৌড়তে দৌড়তে বলল অবিনাশকে লক্ষ্য করে, "এই বুড়ো শূয়োর তুইও থাক। তোকেও আমি দেখে নিচ্ছি।" বলেই গোবিন্দ মিত্তির ধুতি গুটিয়ে কচ্ছপের মত দৌড়ে চলে গেল।

বৃদ্ধ অবিনাশ এতক্ষণ কেঁচোর মতন গুটিয়ে ছিল পাশে এবার এগিয়ে এসে চিন্তিত মুখে বলল, "ভাল করলে না মা। ঐ শয়তানটাকে ওভাবে

চটিয়ে। কতকগুলো বদমাসকে জোগাড় করে এনে হামলা করতে পারে। আর আমি তো এক বুড়ো। তুমিও একটা কচি মেয়ে।"

আমি বাধা দিয়ে বললাম, "আমি আর কচি মেয়ে নেই। এই কদিনে আমি সত্যিই বুড়ী হয়ে গেছি। আপনি ঘরে যান। আমি রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছি।"

আমি এগিয়ে যেতেই বুড়োও আমার পেছু নিল। যেতে যেতে আস্তে আস্তে বলল। তুমি তো এ গ্রামের ব্যাপার জান না মা। আমরা জাতেও যেমন ছোট কাজেও ওদের চেয়ে অনেক ছোট হয়ে থাকতে হয়। আমার মাত্র দেড় বিঘে জমি তাই ঐ বদমাসটার কাছে বন্ধক রয়েছে। আজ দুবছর ধরে নিজে জমি চায় করে অদ্ধেক ধান ওর কাছে তুলে দিচ্ছি। আসল টাকার চেয়ে চার পাঁচ গুন বেশী হয়ে গেছে তবু হুমকি দেয়। আমার কাছ থেকে জমি ছাড়িয়ে নেবে বলে। জান মা রাগ আমাদেরও হয়। কথা আমাদেরও আসে। কিন্তু গলা পর্য্যন্ত এসে আটকে যায়। মুখ দিয়ে আর বের হ'তে পারে না।" একটু থেমে বলল, "চল যাই দেখি কি ব্যবস্থা করতে পারি বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে ওরা আবার এসে পড়তে পারে।"

আমি রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছিলাম। আস্তে বললাম, "কোথায় যাবো?"

"এক গুঁয়েমি কোর না। ওদের হাত থেকে যদি বাঁচতে চাও আমি যেখানে নিয়ে যাই সেখানে চল।"

তবু আমি প্রথমে যেতে চাইনি। শেষ কালে বুড়োর পীড়াপীড়িতে যেতে হল।

দু পা এগোতেই পেছন থেকে বৃদ্ধার ঝাঁঝাল গলা শোনা গেল, "তুমি আবার কোথায় চল্লে এত রাত্তিরে?"

"আসছি—আসছি।"

বৃদ্ধা আবার ঝাঁকিয়ে উঠল,

"সারাদিন খেটে খুটে এসেছ। এখন একটু বিশ্রাম করো এসে। তোমার এখন ওসব ঝামেলায় যেতে হবে না। যেখানে যাবার ওকে পাঠিয়ে দাও ও যাক্। যত দায় সব যেন তোমার।"

আমি আশ্চর্য্য হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। বৃদ্ধ কোন উত্তর না দিয়ে আস্তে করে আমার হাত ধরে টেনে এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগলেন।

এ গ্রামটাও অনেকটা আমাদের গ্রামেরই মতন।

রাস্তাটার দুধারে গাছ পালা ঝোপঝাড়। মাঝে মাঝে দু একটা খড়ের বা টালির চাল দেওয়া ছাদের মাটির ঘর দেখা যায়। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গ্রামের কথা মনে পড়ে গেল। এত দুঃখেও গাছের ফাঁকে ফাঁকে জোনাকী-গুলোর মিটমিট করে গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে জ্বলতে থাকা দেখে সেই ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে গেল। মনে হ'ল এই তো সেদিন সন্ধ্যেবেলায় রাস্তায় বেরিয়ে একটু নিচে জোনাকী জ্বলতে দেখলেই আমি ছুটে যেতাম।

বলতাম, "দেখ্ দাদা কি সুন্দর! না?"

"হ্যাঁ সামনে দেখে চল। অত জোনাকী দেখতে গেলে অন্ধকারে হোঁচট খেয়ে মরবি।"

"তুই একটু দাঁড়া দাদা। দেখ আমি দুটো তিনটেকে এক্ষুনি ধরে আনছি।" বলেই ছুটে যেতাম।

দাদা হাঁ হাঁ করে উঠত। "এই বুড়ো যাস না। তোকে বারণ করেছি না জোনাকী ধরতে। ওদের গায়ে বিষ আছে। যেখানে লাগবে একদম পচে যাবে। এই—এই খবর্দার ধরিস না বলছি।"

কে কার কথা শোনে আমি ততক্ষণে দুটো তিনটেকে ধরে আঁচলের মধ্যে রেখে দিয়ে আবার ফিরে এসেছি। দাদা বলে উঠত, "শিগ্গির ফেলে দে বলছি। আমি বাবাকে গিয়ে বলে দেব বলছি।"

"ঠিক আছে বলে দিস। আমি ছাড়ব না।" আমি আপন মনে ওদের দেখতে দেখতে হেঁটে চলতাম।

"দাঁড়াও এখানে।" বৃদ্ধের কথা কানে যেতেই চমক ভাঙল। দেখলাম সামনে একটা প্রকাণ্ড তিনতলা পুরণো বাড়ি।

আশে পাশে আরও কয়েকটা একতলা দোতলা কোঠাবাড়ি রয়েছে। বাড়ির ভেতর থেকে হারিকেনের মৃদু আলো দরজার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছিল। বৃদ্ধ ডাকলেন "বড় বাবু।"

একবার দুবার তিনবার ডাকতেই ভেতর থেকে আওয়াজ এল 'কে'। 'আমি।'

আমি কে? "কে তুই নাম বলতে পারিস না?" বিরক্তির স্বর ভেসে এল। বৃদ্ধ কোন উত্তর দেবার আগেই ভেতর থেকে আবার জোরে

আওয়াজ শোনা গেল। বোধহয় চাকরকে উদ্দেশ্য করে, "মধু মধু এই মধু দেখতো বাইরে কোন নবাব দাঁড়িয়ে টাকা পয়সা চাইতে এসেছে বলে দে হবে না।"

মধুই বোধ হয় খটাং করে দরজা খুলল। কিন্তু ততক্ষণে বৃদ্ধ দরজার কাছে এগিয়ে একটু আমতা আমতা করে বলল, "বড়বাবু আমি অবিনাশ।"

বড়বাবু ভেতর থেকে রাগত স্বরে উত্তর দিলেন বুঝেছি।

একটু থেমে বললেন, "তা কি দরকার? টাকা পয়সা হবে না বলে দিচ্ছি।"

বৃদ্ধ অবিনাশ একটু কুঁজো হয়ে খোলা দরজার সামনে যেতে মণ্ডা মার্কা মধু দরজার পাশে একটু সরে দাঁড়াল।

"আমি টাকা চাইতে আসিনি বড়বাবু।"

"তা কি করতে এসেছিস। তাড়াতাড়ি শেষ কর।"

একটু থেমে বৃদ্ধ বললেন,

"আপনারা কানে কি কিছু শুনেছেন। ওই মেয়েটার সম্বন্ধে।"

"কোন মেয়েটা?"

ওই যে সে ইমেয়েটাকে ওপার থেকে এনে বদমাসগুলো।

বৃদ্ধ একটু চুপ করে বলল, "আপনি কিছু শুনেছেন?"

আমি একটু এগিয়ে গেলাম। ভেতর থেকে উত্তর এল,

"হ্যাঁ, ওই কি একটু শুনছিলাম। কি যেন আত্মহত্যা-টত্যা করতে যাচ্ছিল। তোরা নাকি বাঁচিয়েছিস।"

আর একটু আস্তে বলল।

"হ্যাঁ, আমি ওকে আশ্রয় দিয়েছি। খুব কি অন্যায় করেছি বড়বাবু।"

বড়বাবুর কিছুক্ষণ কোন উত্তর শোনা গেল না।

বৃদ্ধ আবার বললেন, "আপনি যদি ওর সব ঘটনা শোনেন আপনারও দয়া হবে।"

এবার ভেতর থেকে উত্তর এল, "যাক্, কি ব্যাপার তাই বল।"

বৃদ্ধ সংক্ষেপে প্রথমে কিছু বলে। গোবিন্দ মিত্তিরের ঘটনা বললেন। ঘটনা শোনার একটু বাদে ভেতর থেকে জোরালো স্বর ভেসে এল, "তা

ওই শকুনটার এতে এত গায়ে জ্বালা ধরল কেন। গ্রামের বড় মাতব্বর হয়ে পড়েছে। চোটার কারবার করে? হ্যাঁরে মেয়েটা কোথায়?"

"সঙ্গে করে এনেছি।"

"কই দেখি।" বলে চটি পায়ে দিয়ে হ্যারিকেন হাতে নিয়ে একজন প্রৌঢ় লম্বা ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। আমি সামনেই দাঁড়িয়েছিলাম। আমার আপাদমস্তক হ্যারিকেনের আলোয় ভাল করে দেখার পর ওনার মুখ দিয়ে শুধু একটা শব্দ বেরল 'হুঁ'।

হ্যারিকেনটা হাতে ঝুলিয়ে উনি কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন। ফর্সা কপালটা মাঝে মাঝে একটু কুঁচকে গেল মনে হ'ল। মাঝে মাঝে দু একবার আমার দিকে তাকিয়ে লক্ষ্যও করলেন। দেখতে দেখতে দরজার সামনে আরও দু চারটে মুখ এসে দাঁড়াল। ওপর তলায় তাকিয়ে দেখলাম। সেখানেও দু একটা মুখ চোখে পড়ল। সবাই তখন আমাকে অদ্ভুত ভাবে লক্ষ্য করছে।

একটু বাদে তিনি বললেন, "ঠিক আছে ও আমার এলাকাতেই থাকবে। বাড়িতে তো রাখতে পারি না।

ঐ পুকুর ধারে একটা ছোট ঘর আছে। সেখানেই এখন থাকুক। যা মধু দেখিয়ে দিয়ে আয়।" একটু থেমে বললেন,

"আজ রাত্রিটা তোর ওখানে থাকতে দে অবিনাশ। কালকে না হয় ওঘরে এসে থাকতে পারে।"

আমি বললাম, "না। আমি আজ রাত্তির থেকেই থাকবো।"

"ঠিক আছে। যা মধু একটা হারিকেন দিয়ে ওর ঘরটা দেখিয়ে দিয়ে আয়।"

বৃদ্ধ অবিনাশ কোন কথা বললেন না।

সেই রাত্তির থেকে কিছুদিন আমি ঐ ঘরেই ছিলাম।

ওটা ছিল রায়চৌধুরীদের পাড়া। ওনারা ছিলেন গ্রামের সবচেয়ে প্রভাবশালী লোক। তাই গোবিন্দ মিস্তিরের দল জানতে পেরেও কোন উৎপাত করতে সাহসী হ'ল না।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ওখানেও গণ্ডগোল বাধল। আর সেটা বাধাল বাড়ির মেয়েরা।

বাড়ির কর্তা রাজেশ রায়চৌধুরীর দুই ছেলে থাকত কলকাতায়।

মাঝে মাঝে বাড়ি আসত। বড় ছেলের বিয়ে হয়েছিল কিছুদিন আগেই। বউ বাড়িতে থাকত। ছোট ছেলে কলকাতার কোন এক কলেজে পড়ত।

বড়বাবু আমাকে প্রথমে অনেক রকমে সাহায্য করেছিলেন।

এমনিতে কড়া ধরনের আর রাগী হ'লে কি হবে। মনটা ছিল সাদা। আর ছিল গরীব অভাগাদের প্রতি দয়া।

তবু কিছুদিনের মধ্যেই আমার ব্যবস্থা আমিই করে নিলাম।

লোকের বাড়িতে ঝি খাটা আমার পোষাবে না বুঝলাম।

দোকানে দোকানে গিয়ে ঠোঙা তৈরী করা শিখে, বাড়িতে এসে কাগজ কিনে ঠোঙা তৈরী করে দোকানে দোকানে দিয়ে আসতাম। কেউ কেউ বাড়ি থেকে এসেও নিয়ে যেত। আর সামান্য সোনাটুকু বিক্রী করে তার সঙ্গে গোলামদার টাকা কটা যোগ করে কিছু কাপড় কিনে সেলাইয়ের কাজ আরম্ভ করলাম।

টেবিল ঢাকা কাপড় এই সবই তৈরী করতাম কেটে কেটে। আর তার ওপর ফুল নক্সা এঁকে বাজারের দোকানে বা মেলায় বিক্রী করতাম। তবু এও আমার কপালে সহ্য হ'ল না। বড়বাবুর ছোট বড় দুই ছেলেই উৎপাত আরম্ভ করল।

ছোট ছেলের তখন ঘন ঘন বাড়ি আসা পড়ে গেল।

ওঃ, ছোট ছেলের নিজের বাড়ির আড়ালে আমার ঘর থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে সে কি সিগারেট ফোঁকা। ওই একুশ বছর বয়সের ছেলে হবে বড় জোর কিন্তু দিনের মধ্যে দু চার প্যাকেট সিগারেটই বোধ হয় পোড়ে যেন আমার ঘরটার সামনে।

আর নজরটা থাকত আমার ঘরের দিকে।

আর বড় ছেলে আরও একটু বুদ্ধিমান। তার ওপর ঘরে বউ রয়েছে।

তিনি এসে প্রায় সারাদিনই আমার ঘরের সামনের পুকুরটায় ছিপ নিয়ে বসে থাকতেন। মাছ ধরা চলত আমার ঘরের দিকে লক্ষ্য করতে করতে। ওদের সামনে আমি প্রায় ঘর থেকেই বেরতাম না। তবু বেড়ার ফাঁক দিয়ে সব আমার নজরে আসত। এই নিয়ে বাড়িতে একটা গুমোট

আবহাওয়ার সৃষ্টি হ'ল কিছুদিনের মধ্যেই। তারপরেই একদিন ঝড় উঠল রায়চৌধুরী বাড়ীতে। আর সেই ঝড়ের আঘাতে আমাকে ছিটকে বেরিয়ে আসতে হল রাস্তায়।

আমি ও বাড়িতে যেতাম খুব সামান্যই। তবুও ওরই মধ্যে বুঝতে পারলাম আমাকে নিয়েই ও বাড়ীতে ভীষণ গণ্ডগোল বেধে গেছে। শেষ কালে বাধ্য হ'য়েই বড়বাবু এসে আমাকে জানিয়ে গেলেন।

যাবার সময়ে বলে গেলেন, "আমি আর সহ্য করতে পারছি না রে। বাইরের লোকের কথা আমি গ্রাহ্য করি না। এ গ্রামে এখনও কারও এত সাহস হয়নি আমার মুখের ওপর কথা বলে। তবু এতদিনে অনেক কথা ছিটকে এসে কানে ঢুকেছে। তবু আমি কিছু গ্রাহ্য করিনি। কিন্তু আমার বংশের দুটো কুলাঙ্গারের জন্যে আজ আমার বাড়িতেই আমার থাকা অসহ্য হয়ে উঠেছে।"

খানিকটা হেঁটে গিয়ে আপন মনে বলে উঠলেন, "আমি আর কি করব? আমার কিছু করার নেই। এ সমাজ বড় নিষ্ঠুর। সেখানে কোন রকমে একবার পিছলে পড়লে আর বোধ হয় কোনদিন তার কাছ থেকে ক্ষমা পাওয়া যায় না।"

আমি ঘরের চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে দু হাতে দরজার দুটো পাল্লা ধরে ওনার চলে যাওয়া দেখলাম। শেষের কথাগুলো মনে পড়তেই আমার মনে হল উনি মিথ্যে কথা বলে গেলেন। এ সমাজ পুরুষদের। সেই জন্যে তারা বারবার পিছলোলেও এ সমাজের এমন কোন ক্ষমতা নেই তাদের শাস্তি দেয়। এ সমাজের একমাত্র নিয়ম পুরুষদের যথেচ্ছাচার ও মেয়েদের নির্য্যাতন।

তার পরের দিনই ওঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম।

অনেক কষ্টে ঐ গ্রামেরই আর একটা পোড়ো বাড়ীর এক পাশে আমার ঘর সংসার পাতলাম। আসবার সময়ে বড়বাবুকে প্রণাম করে চলে এলাম। তিনি আস্তে মুখটা তুলে প্রশ্ন করলেন খুব নরম সুরে,

"কোথায় যাচ্ছিস রে বড়ী?"

"জানি না। যদি এ গ্রামে ঠাঁই না হয় অন্য গ্রামে চলে যাব। আর আপনার দয়া আমি চিরকাল মনে রাখব।"

বড়বাবু কোন উত্তর দিলেন না। আমি আস্তে আস্তে আমার পোঁটলাটা নিয়ে বেরিয়ে এলাম।

আর সেই দিন থেকে আরম্ভ হল আমার অসহায় নারী জীবন।

পুরুষদের লোভী কুৎসিৎ কামার্ত চোখ আর হিংস্র চেহারা জঘন্য ভাবে দেখতে দেখতে ওই জাতটাকে আমি যে কি ঘেন্না করতাম। আর শুধু অভিশাপ দিতাম এই পৃথিবীকে। কতদিন অসহ্য হয়ে উঠেছে। আমি শেষ করতে গিয়েছি এই শরীরটাকে। কিন্তু কিছুতেই তা সম্ভব হয়নি। যে কোন একটা বাধা এসে জুটেছে বা নিজেই ফিরে এসেছি। শেষ কালে নিজের ওপরেই ঘেন্না হ'তো। এই পচা শরীরটার ওপর এত মায়া আমার। উঃ প্রতিদিন সন্ধ্যের পরে যে কি উৎপাত।

গান শিষ নানা রকম রসালো মন্তব্য। মাঝে মাঝে খিস্তী। এই সব চলত আমি যেখানে থাকতাম তার সামনে। অন্য বাড়ি ঘর দোর একটু দূরে দূরে ছিল। তাই ওদের বিশেষ কোন অসুবিধে হ'ত না। আমি দরজা বন্ধ করে বসে থাকতাম। সাধারণতঃ অল্প বয়েসী ছোকরাগুলো এসে গোলমাল করত। আবার লোকজন দেখলে সরে পড়ত। কিন্তু আধা বয়েসি প্রৌঢ় এই সমস্ত পাকা ঘোড়েলগুলো হানা দিত বেশী রাত্তিরে। ওরা গোলমাল করত না। একা একা আসত। বন্ধ দরজার সামনে এসে কত কি মোলায়েম কথা বলত আস্তে আস্তে কত কাকুতি মিনতি একটু দরজাটা খোলার জন্যে। এক একদিন অতিষ্ঠ হয়ে বলে উঠতাম, "মুখে মারব এক লাথি। চলে যা শূয়োর।" কত গালাগালি করতাম। মুখে যা আসত তাই বলতাম। তবুও নড়তো না জানোয়ারগুলো। অবশ্য সবাই না। যখন অবিশ্রান্ত গালাগালি করে যেতাম তখন কেউ কেউ পালিয়ে যেত।

একদিন একটা গলার স্বর শুনে চমকে গেলাম। খুব মোলায়েম স্বরে দরজায় মুখ রেখে ডাকছে, "এ্যাই এ্যাই একটু খোলনা দরজাটা।"

অ্যাঁ, এযে গোবিন্দ মিত্তির শেষকালে গ্রামের মাতব্বর। এই পঞ্চাশ বছরের বুড়ো কচ্ছপটাও।

ও তখনও ডাকছে, "এ্যাই, এ্যাই।"

মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, "যাও না বাড়িতে। কেন সেখানে কি বউ মেয়ে সব মরে গেছে ?

"কি বললি ?"

মুখ খিঁচিয়ে ভেতর থেকে বললাম,

"যা বলেছি সব তো শুনেছ। তবু দাঁড়িয়ে আছ কি আরো কিছু শুনতে।"

"এত কিছুর পরেও এত আস্পর্দ্ধা। এত তেজ ? জানিস এক্ষুণি তোকে জুতো মেরে তাড়াতে পারি।"

"চেষ্টা করে দ্যাখো না। দেখবে তোমার লোকজনেরা এবার তোমাকেই জুতো মেরে এ গ্রাম থেকে তাড়াবে। প্রত্যেককে শুধু একবার করে হেসে হাতটা একটু ছুঁয়ে দিয়ে যাব। ব্যস্, তোমার দলের লোকেরা তোমাকেই কচ্ছপ বানিয়ে দেবে।"

গোবিন্দ মিত্তির চুপ করে গেল। তবু নড়ল না বুঝলাম।

একটু বাদেই আবার গলার নরম স্বর শোনা গেল,

'এত রাগ করছিস কেন ?'

আমি চুপ করে থাকলাম।

"তোর রেট কত বল না।"

"আমার রেট ?" বলেই খিল খিল করে হেসে উঠলাম। "শুনবে ? শুনবে আমার রেট ?"

"বল না দেখি। আবার বাড়িয়ে বলিস না যেন।"

"না না তাই কি বলতে পারি। তুমি আমার কত পেয়ারের লোক। প্রথম দিনেই আলাপ অন্যায় হবে না তাহলে।" আবার খিলখিল করে হেসে উঠলাম, "শোন খুব মন দিয়ে শোন আমার রেট। ঐ যে তোমার সিন্দুকে। অসহায় গরীবদের রক্ত চুষে চুষে যে সুদের টাকা কটা জমিয়েছ, ঐ কটা টাকাই মাত্র আমার রেট বুঝেছ। মাত্র ঐ কটা টাকা।" আবার একটানা হেসে চললাম আমি। হঠাৎ মনে হল বাইরে তো সাড়া শব্দ পাচ্ছি না। কান পাতলাম দরজায়! না কোন শব্দ নেই। দরজাটা খুলে ফেললাম। আলো নিয়ে দেখলাম। না কেউ কোথাও নেই। গোবিন্দ মিত্তির নিঃশব্দে পালিয়ে গেছে।

চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু খুব বেশীদিন ওদের ঠেকিয়ে রাখতে পারিনি। একদিন একটু অসাবধান হয়ে ঘরটা ভেজিয়ে রেখে সন্ধ্যের পর দোকানে গেলাম। এসে ঘর বন্ধ করলাম। কিন্তু ঘরে লোক ঢুকে লুকিয়েছিল। ওকে দেখে চিৎকার করতে গেলাম। একটা চকচকে ছোরা বের করে বুকের কাছে ধরল। ভয়ে কাঠ হয়ে গেলাম। তারপরে আমার সামান্য বাধা ও গ্রাহ্যই আনল না।

আর একদিন দুপুর বেলাই ভেজান দরজা ঠেলে আর একজন ঢুকল। আমি তখন তরকারি কুটছিলাম। কিছু বোঝবার আগেই, হাত দিয়ে মুখ চেপে এক হ্যাঁচকায় মাটিতে চিৎ করে ফেলে চেপে বসল।

পরে ভাবলাম। এভাবে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করে কোন লাভ নেই।

শেষকালে তাই সে নাছোড়বান্দা। তাকে আর বাধা দিতাম না। ওদের কিছু বলতামও না। যার যা খুসি টাকা পয়সা দিয়ে যেত। সেগুলো এক পাশে একটা হাঁড়িতে ফেলে রাখতাম। দেহ বেচা পয়সা দিয়ে কোনদিন আমি পেট চালাইনি। ওই ঠোঙা বেচে আর সেলাই করে যা পেতাম তাই দিয়েই পেট চলে যেত।

এই ভাবে কিছুদিন যেতেই আস্তে আস্তে সব কিছুই গা সওয়া হয়ে গেল। খুব বেশী বাড়াবাড়ি না করলে ওদের অত্যাচারে তখন খুব একটা কষ্টও হোত না। ভালও লাগত না। চুপচাপ পড়ে থেকে সব সহ্য করে যেতাম। এই ভাবেই প্রায় আরও এক বছরের ওপর কেটে গেল। এর মধ্যে কত পুরুষ এল, গেল। কতজনে ভাবের ঘোরে কত কি বলল। কেউ বলল, "তোমাকে আমি ভালবাসি।" কেউ বলল "তোমাকে দেখে আমি পাগল হয়ে গেছি।" কেউ বলল তোমাকে নিয়ে আমি পালিয়ে গিয়ে আলাদা ঘর বাঁধব। এই সব আরও কত কি বলল। আর কাজ ফুরিয়ে রাস্তায় পড়েই তাদের মন থেকেও সব কিছু ধুয়ে ফরসা হয়ে বাড়ি চলে গেল।

প্রথম প্রথম অবাক হতাম। ভালও লাগত। একটু একটু আশাও হ'ত। আর শেষকালে শুধু হাসতাম।

ঠিক এমনি সময়ে গ্রামে একটা নতুন লোক এল। লোকটাকে কয়েকদিন

দিনের বেলায় সামনের রাস্তা দিয়ে যেতে দেখেছি। নতুন এসেছে বুঝলাম। তবু কি রকম যেন। সব সময় একটা লাট খাওয়া খাকি প্যাণ্ট আর আধ ময়লা একটা হাফ হাতা সার্ট গায়ে ঘুরে বেড়ায়। পায়ের জুতো মোজা বেশ দামী মনে হয়। তবু জুতোটায় কালি পড়ে না যেন কতকাল। মাথায় ঝাঁকড়া রুক্ষ চুল। গাল দুটো ভাঙা। তাতে একগাল দাড়ি। চোখ দুটো ভেতরে ঢোকা। তবু চাউনিটা ভাল। কি রকম একটা উদাস উদাস ভাব।

রংটা কোড়া আমার মত। টিকলো নাকের নিচের ঠোঁট দুটো নিচেটায় আড়াআড়ি ভাবে চিবুক পর্যন্ত একটা লম্বা কাটা দাগ।

দু একদিন বাদেই লক্ষ্য করলাম। লোকটা অদ্ভুত ভাবে আমার ঘরের দিকে তাকাতে তাকাতে চলে যেত। আর তখন নিচের ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে চেপে ধরা থাকত। আর চিবুকের কাটা দাগটা তখন একটা সরু দড়ির মত ফুলে থাকত। লোকটার হাঁটা চলা চাউনি সব কিছুই আমার অদ্ভুত লাগত। তবু ওকে কোনদিন কারুর সঙ্গে কথা বলতে শুনিনি। সব সময় একা। একটু আশ্চর্য্যও হতাম মনে মনে।

হঠাৎ একদিন বিকেল বেলায় যখন সেলাই করছি ঘরে বসে বসে দেখি লোকটা আমার ঘরের দিকেই আসছে। প্রথমে একটু আশ্চর্য্য হলাম। তারপরেই কি রকম ঘেন্না হতে লাগল লোকটাকে। ছিঃ ছিঃ। এই লোকটাও ওদেরই দলের।

বারান্দার সামনে এসে কিছুক্ষণ আমাকে দেখল। তারপরেই এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। আমি কিছু না বলে সেলাই করে যেতে লাগলাম একটু বাদে লোকটার কথা এই প্রথম শুনলাম,

"আমি আপনার কথা সব শুনেছি।"

একটু চমকে উঠে গম্ভীর ভাবে বললাম,

"আমাকে আপনি কেউ বলে না। আপনিও তুমি বলতে পারেন।"

লোকটা একটু যেন থতমত খেয়ে গেল। একটু থেমে বলল। "ওঃ! আচ্ছা তাই বলব।"

সেলাই করতে করতেই বললাম,

"আমার কথা শুনে বুঝি একবার চোখে দেখার ইচ্ছে হ'ল?"

"হ্যাঁ।" লোকটা যেন আশ্চর্য্য হয়ে গেল।

আমি চোখ ঘুরিয়ে বললাম, "টাকা পয়সা সঙ্গে আছে তো?"

"টাকা পয়সা? হ্যাঁ তা কিছু আছে বটে।"

"ঠিক আছে। তাহলে সন্ধ্যার পরে আসবেন। বিকেলে ওসব কাজ হয় না।"

লোকটার চোখদুটো যেন একটু জোরাল হয়ে গেল। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "টাকা পয়সার দরকার থাকলে কিছু আমি দিতে পারি। কিন্তু যে কাজের কথা বলছ, সে কাজ করতে আমি আসিনি।"

"তবে কি করতে এসেছেন? আমার মুখ দেখতে?"

লোকটা ফিরে হাঁটতে লাগল। যেতে যেতে বলল "না। মুখ দেখার লোভ আমার নেই। এসেছিলাম দুটো কথা বলতে। কিন্তু আজ তুমি আমাকে বড়ই অপমান করেছ। তাই চলে যাচ্ছি।" বলেই লোকটা হন্ হন্ করে চলে গেল।

আমিও পেছনে চিৎকার করে বললাম, "কথা বলার জন্যে এখানে আর আসার দরকার নেই। মরণ আর কি। দুনিয়া ঘুরে উনি আর কথা বলার লোক খুঁজে পেলেন না।"

ভাবলাম যাহোক লোকটাকে কিছু শিক্ষা দেওয়া গেল। একটু জ্ঞান থাকলে সহজে আর এদিকে আসবে না। আবার মনে হ'ল লোকটা হয় বোকা না হয় পাগল।

তবু লোকটাকে এদিকে আসতে দেখে যতটা ঘেন্না হয়েছিল, লোকটার ব্যবহারের পরে ওকে আর কিছুতেই ততটা ঘেন্না করতে পারলাম না।

তবু ভাবলাম। মরুকগে, আমার অত চিন্তা করার কি আছে। তারপরে দুদিন আর কোন পাত্তা নেই। ভাবলাম বোধ হয় চলে গেছে।

কিন্তু তৃতীয় দিন সন্ধ্যার একটু পরেই লোকটাকে এদিকে দেখে একটু চমকে গেলাম।

এসে আমার বারান্দার সামনে দাঁড়িয়ে একটু করুণ ভাবে হেসে বলল,

"আমি আবার এলাম।"

আমি দরজায় হেলান দেওয়া অবস্থায় ভুরু দুটো কুঁচকে বললাম, 'সে তো দেখতেই পাচ্ছি।'

আবার একটু হাসল বলল,

"কেন এলাম জিজ্ঞেস করলে না ?"

"কি দরকার। পুরুষরা আমার এখানে একটা দরকারেই আসে।"

"না। আমি সে দরকারে আসিনি।"

বিরক্ত হ'য়ে বললাম, "কি দরকারে এসেছেন দয়া করে. শুনতে পারি কি।"

"তোমার কথা শোনার পরে তোমার সঙ্গে দুটো কথা বলার আমার খুব ইচ্ছে।"

আমি আরও বিরক্ত হয়ে বললাম, "আচ্ছ, আপনি আমাকে এ ভাবে বারবার বিরক্ত করতে আসছেন কেন ?"

লোকটা অবাক হ'য়ে ফ্যাল ফ্যাল করে আমার মুখের দিকে তাকাল।

আমি অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললাম, "আমার সম্বন্ধে কিছু শুনেছেন ?"

"তোমার জীবনের সব ঘটনা।"

"অবিনাশ ঘোষের কাছে।"

একটু চম্‌কে উঠলাম। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলাম।

ও তো কোন কথা বলল না। একটু বাদে গম্ভীর ভাবে বললাম,

"কিন্তু আমার সঙ্গে আপনার কি কথা থাকতে পারে ?"

ও একটু চুপ করে থেকে বলল।

"একটু ঘরে আসব ?"

আমি দরজাটা ছেড়ে আলো নিয়ে ভেতরে ঢুকলাম।

ভেতরে ঢুকে খাটের এক কোণায় বসে তিনটে দশ টাকার নোট বিছানার ওপর রাখল।

আশ্চর্য্য হয়ে বললাম, "অত টাকা কি হবে।"

"তুমি আনতে বলোছলে না।"

"হ্যাঁ, কিন্তু আপনি তো বললেন আপনি এজন্তে আসেননি। আর অত টাকা আমাকে ভোগ করতে গেলে লাগে না।"

লোকটা মাথার উস্কোখুস্কো চুলের মধ্যে হাত চালিয়ে দিয়ে বলল, "সত্যিই আমি সে জন্তে আসিনি। কিন্তু তোমার সময় তো অনেক নষ্ট করছি।"

আমি গম্ভীর ভাবে বললাম "আমি পেশাদারী নই।"

"সে আমি জানি।"

"তবে টাকা দিচ্ছেন কেন?"

লোকটা একটু বিব্রত ভাবে বলল, "এমনি, এমনিই দিচ্ছি ধরে নাও। রাখতে দোষ কি?"

চিৎকার করে বললাম,

"না। আমি ভিখিরী না। ভাল চান তো টাকা তুলে নিন।"

"আচ্ছা নিচ্ছি।" বলেই তাড়াতাড়ি নোটগুলো পকেটে ঢুকিয়ে নিল।

কিছুক্ষণ আবার কেউ কোন কথা বললাম না। একটা চাপা অস্বস্তি যেন ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল। আমি আশ্চর্য হয়ে ভাবতে লাগলাম। এ কেমন পুরুষ মানুষ। যেখানে কিছু চাইবারও দরকার হয় না, একটু জোর করলে বা টাকা দিলেই পাওয়া যায়, সেখানে কিসের এত সঙ্কোচ? লোকটা একটু একটু উসখুস করতে লাগল। কিন্তু কিছু বলে না দেখে আমিই বললাম,

"কি হল? কি কথা টথা বলবেন বলছিলেন, বলবেন না?"

লোকটা কি বোধ হয় চিন্তা করছিল। হঠাৎ তাই একটু চমকে উঠে বলল, "হ্যাঁ বলব।"

অধৈর্য্য হয়ে একটু টেনে বললাম "তা বলুন।"

"হ্যাঁ বলছি···ইয়ে।" আমার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বলল, "তুমি আমাকে বিয়ে করবে?"

"বিয়ে?" বলেই আমি খিলখিল করে হাসতে লাগলাম। খুব একচোট হাসার পরে বললাম। সে আরও পরে বলতে হয়। আপনি আমাকে এখনও একটু ছুঁলেনও না। তার আগেই বলে ফেললেন? না আপনি নেহাৎই পুরুষ নন?"

লোকটা বড় বড় চোখ করে উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে পড়ল, "না। সত্যিই আমি পুরুষ নই।"

'তবে কি?' চোখটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে বললাম, "মা কালির প্রসাদ বোধ হয় একটু বেশী পেটে পড়েছে আপনার। দেখে কিন্তু ত মনে হচ্ছে না।"

"মা কালির প্রসাদ? সে আবার কি?"

"তাও বোঝেন না? তবে বোঝেন কি?"

লোকটা আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, "তুমি কি বলতে চাও স্পষ্ট করে বলো।"

আমি একটু গম্ভীর হ'যে বললাম, "কতটা তাড়ি গিলে এসেছেন ?"

"তাড়ি ?"

হ্যাঁ, "তাড়ি। তাছাড়া আপনাদের আর কিছু তো জুটবে না।"

লোকটা কোন উত্তর না দিয়ে কিছুক্ষণ বোকার মত আমার মুখের দিকে তাকাল। তারপরে আস্তে আস্তে আবার খাটের কোণাটাতেই বসে পড়ল। আর ওর মুখটার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ আমার কি রকম মায়া হতে লাগল। মুখে কে যেন এক পোঁচ কালি ঢেলে দিয়েছে। আস্তে আস্তে ধরা ধরা গলায় বলল, "জান আমার আর এখানে এক মুহূর্তও থাকতে ইচ্ছে করছে না ; কিন্তু কেন যেন আমি এখান থেকে চলে যেতে পারছি না।"

"কেন ?"

"তুমি আমার কোন কথা বিশ্বাস করতে পারছ না যে।"

"বিশ্বাস করলে আপনি চলে যাবেন ?"

"হ্যাঁ। তুমি না বললেই আমি চলে যাব।"

"ঠিক আছে। বলুন কি বিশ্বাস করতে হবে।"

"আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।"

"কিন্তু কেন ? আমাকে একটা নষ্ট চরিত্রের বেশ্যা জেনেও কেন আপনি আমাকে বিয়ে করতে চাইছেন ?"

লোকটা হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে জোরে দৃঢ় কণ্ঠে বলে উঠল, "আমি জানি, তুমি নষ্ট চরিত্রের বেশ্যা নও। শুধু আমি নয়। একথা তুমি নিজেও বিশ্বাস কর।"

উত্তেজিত ভাবে ঘরে পায়চারি করতে করতে বিড় বিড় করে বলতে লাগল, "ওটা হচ্ছে তোমাদের এই ঘৃণ্য সমাজের দেওয়া নাম। আর এই রকম সমাজ ব্যবস্থাকে তৈরী করেছে, একদল স্বার্থপর, গোঁড়া কুসংস্কারাচ্ছন্ন, বদমাস পুরুষ, নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে এরা সমাজকে ব্যবহার করছে। আর তাকেই অন্ধের মত মেনে নিচ্ছে আর একদল তাদেরই প্রায় সমগোত্রীয় দুর্বল আর ভীতু মন নিয়ে। যারা শক্তিমান

তারা সমাজকে পরোয়া করে না। তাদের কাছে নিজেদের বিচার বুদ্ধি আর যুক্তিই প্রধান।

কি দোষ করেছ তুমি সমাজের কাছে। যে নিজের জীবন বাজি দিয়ে আজ নিজেকে সমাজের সবচেয়ে ঘৃণ্য জীব ব'লে এক নষ্ট চরিত্র বেশ্যা ব'লে তোমাকে পরিচয় দিতে হচ্ছে।

মানুষের ছদ্মবেশী নরকের কীট বদমাসগুলো একটা কাচ নিষ্পাপ মেয়েকে জোর করে টেনে এনেছে এই পথে। সমাজ তার কি করেছে? না। একটা বেশ্যা নাম দিয়ে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে নরকে? এই সমাজকে তুমি পরোয়া কর? কেন কর? লাথি মেরে চলে এস ঐ সমাজের মুখে। দেখবে যে তোমাকে আবার স্বীকার করে নিয়েছে।" লোকটা বলতে বলতে উত্তেজনায় কাঁপতে লাগল। চোখ বড় বড় হয়ে গেল। কপালে ছোট ছোট ঘামের ফোঁটা দেখা গেল। আর আমি ওর কথা শুনতে শুনতে কোথায় যেন নিজেকে হারিয়ে ফেললাম। আপন মনে কখন যে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়েছে খেয়ালই নেই। লোকটা তখনও পায়চারি করতে করতে দু'একটা কথা বলে চলেছে। হঠাৎ মনে হ'ল বুকটার কাছে কি রকম ঠাণ্ডা লাগছে। হাত দিতেই বুঝলাম ব্লাউজটার অনেকটা ভিজে গিয়েছে। আশ্চর্য হয়ে ভাবলাম। আমি যে ভাবতাম আমার চোখ দিয়ে আর কোনদিন জল পড়বে না। সব জল কবে যেন শুকিয়ে গিয়েছিল। শুধু মাঝে মাঝে তীব্র ঘৃণায় চোখ দুটো জ্বলে উঠত। আর আজ আশ্চর্য হয়ে ভাবলাম এত জলও আমার চোখে জমা ছিল। সে যেন বাঁধ ভাঙা বন্যার মত হু হু করে ছুটে এসে ভাসিয়ে দিতে লাগল জামা কাপড় সব। কাঁদতে কাঁদতে এক সময় বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে বালিসে মুখ গুঁজে বললাম, "এতদিন কোথায় ছিলে তুমি? এতদিন কেন আসনি তুমি আমায় উদ্ধার করতে?"

ও এসে আস্তে আস্তে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, "আমি শুধু তোমাকেই উদ্ধার করতে আসিনি বুড়ী। আমি নিজেও উদ্ধার হতে এসেছি। আমার জীবনটাও যে বড় কষ্টের। আমিও আর সহ্য করতে পারছি না। তুমি শুনবে?"

আমি আস্তে আস্তে উঠে এগিয়ে গেলাম। ওর মুখোমুখি সোজা দাঁড়িয়ে

মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, "আজ থাক্। তোমাকে যতটুকু চিনেছি সেইটুকু আজ আমাকে ভাল করে বুঝতে দাও।"

"কিন্তু তোমাকে যে আর একটু আজকেই শুনতে হবে বুড়ী।" ব'লে ও একটু করুণভাবে হাসল। "শোন আমি হাওড়ায় এক ফ্যাক্টরীতে কাজ করি। পয়সাও খুব একটু, খারাপ আয় করি না। তবু আমি জানি কোন মেয়ে জেনে শুনে আমাকে স্বামীত্বে বরণ করতে পারবে না। কারণ স্বামীর কাছে স্ত্রীর সবচেয়ে বড় যে আকাঙ্খা, সেই সন্তান দেওয়ার কোন ক্ষমতা আমার নেই। আমি পুরুষত্বহীন।"

আমি আর থাকতে পারলাম না। ওর পা দুটো জড়িয়ে ধরে ভাঙা গলায় বললাম, "তুমি আমার দেবতা! ওগো তুমি আমার দেবতা। নাই বা দিলে সন্তান। শুধু তোমার স্ত্রীর মর্য্যাদাটুকু আমায় দিয়ো। সেই আমার জীবনের পরম ধন হয়ে থাকবে।"

আমি কাঁদতে লাগলাম ওর পায়ে মুখ রেখে।

ও সরে গেল না। শুধু নিচু হ'য়ে মাথার চুলে হাত বুলোতে বুলোতে বলল খুব আস্তে আস্তে, "তাই হবে বুড়ী। কাল সকালেই আমরা এ গ্রাম ছেড়ে কলকাতার ভীড়ে মিশে যাব। সেখানে তোমাকে কেউ চিনবে না। কেউ বিরক্ত করবে না। আমাদের বিয়ে হবে কালিঘাটে। জাগ্রত কালী-প্রতিমা হবেন আমাদের বিয়ের সাক্ষী। তুমি আর আমি হব স্বামী-স্ত্রী। ঘর বাঁধব আমরা নতুন করে। কেমন?" বলেই ও দুহাত দিয়ে আমাকে টেনে তুলে বুকে টেনে নিল। আমি ওর বুকের মধ্যে মুখ রেখে মিশে যেতে যেতে কি এক আনন্দে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলাম। তারপরেই আবার চোখ বেয়ে ঝর ঝর করে জল নেমে আসল। বুঝলাম এ কান্না দুঃখের না, আনন্দের। ওর বুক ভেসে যেতে লাগল। চোখের জলে, ও আমাকে আরো জোরে টেনে নিল বুকে। অবশ হয়ে এক সময় যেন হারিয়ে গেলাম ওর বুকের মধ্যে।

তার পরের দিন ভোর বেলায় আমরা ও গ্রাম ছেড়ে চলে এলাম। কেউ জানতেও পারল না। ও গ্রামের কোন লোক। তারপরে আমরা বিয়ে করে স্বামী স্ত্রী হয়ে ঘরভাড়া নিয়ে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াই।

মাঝে মাঝে ছুটি পেলে আমরা ঘুরতে বেরিয়ে পড়ি।

ও আমাকে বলেছে বার বার "বুড়ি তুমি যদি মনের মত কাউকে পাও তো দেহের স্বাদ মিটিয়ে নিও আমায় জানিয়ে। আমি তাতে কিছু মনে করবো না। তবু একটা স্বান্তনা থাকবে স্বামী হয়ে যে তৃপ্তি তোমাকে আমি দিতে পারি না, তার অন্ততঃ কিছুটা সুযোগ করে দিতে পেরেছি।"

বুড়ী একটু চুপ করে থেকে বলল তবু তোমাকে দিয়েই আমার শেষ। আর কাউকে আমি শরীর দেব না কোনদিন। তোমার পাগলের মত অবস্থা দেখে আমার মায়া হয়েছিল। তাই তোমাকে আমি সুযোগ দিয়েছিলাম। কিন্তু আর না।

জান আমি ওকে ছেড়ে কোনদিন কোথাও কেন যেতে পারব না? ও বড় অসহায়। আমি ছাড়া পৃথিবীতে ওর আর কেউ নেই। ছোটবেলা থেকে বাপ মা হারা ছেলেটা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছে। ওর আত্মীয় স্বজন কেউ ওকে দেখেনি একবারও চেয়ে। দোকানে দোকানে চায়ের কাপ ডিস ধুয়ে বেড়িয়েছে। কুলির কাজ করেছে। তবু তারই মধ্যে একে ওকে ধরে লিখতে পড়তে শিখেছে। ওর কোন ডিগ্রির ছাপ নেই। তবু বই পড়াই ওর নেশা।

ও সব কিছু পড়তে জানতে খুব ভালবাসে। তবু ওকে সারাজীবন লোকে শুধু ঠকিয়েছে। কত কষ্ট করে নিজে এই চাকরীটা যোগাড় করেছে। আস্তে আস্তে উন্নতিও করেছে। তবুও ভীষণ আত্মভোলা। আমি যদি একদিন ওর কাছে না থাকি, ও হয়ত খাওয়ার কথাই ভুলে যাবে।

ও আমাকে ওর নিজের থেকেও বোধ হয় বেশী ভালবাসে। ও বড় অসহায়। ওকে ছেড়ে কোনদিন কোথাও আমি যেতে পারব না। তুমি চলে যাও। আর এসো না এদিকে। আমরা হয়ত শিগ্‌গির এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাব। বাড়িওয়ালা এসে খুব লম্ফঝম্প করে সাত দিনের নোটিশ দিয়ে গেছে। শেষ কালে বলে গেছে কি জান?

"এটা ভদ্রলোকের পাড়া। খারাপ কিছু ঘটবার আগে যেন ভালয় ভালয় চটপট সরে পড়ি।"

আমি একবার বুড়ীর মুখের দিকে তাকালাম। দেখলাম চোখের জল তত স্পষ্ট বোঝা না গেলেও হারিকেনের আলোয় চোখের সুন্দর পাতা দুটো চিক চিক করছে।

আমি সামনের দরজার দিকে এগোতেই ও বাধা দিল।

"তোমাকে মারবে বলে ওরা শাসিয়ে গেছে। সামনে দিয়ে বেরিয়ে কাজ নেই।"

বলেই ও পেছনের দরজা খুলে উঠোনের ছোট পাচিলটার কাছে একটা টুল এনে দিল।

টুলের ওপর পা দিয়ে পাঁচিলের ওপর লাফিয়ে উঠলাম। ওপাশেই রাস্তার অন্ধকারে ওর মুখ স্পষ্ট দেখা গেল না। আস্তে বললাম "যাই"।

"এসো।"

টুপ করে পাঁচিল টপকে রাস্তায় পড়ে হন হন করে হাঁটতে লাগলাম বাড়ির দিকে।

মিলু ঘড়ি দেখিস না খবর্দার। ধেনো লাফ মেরে দাঁড়িয়ে পড়ে শ্লোগান দেওয়ার ভঙ্গীতে হাত দু'টো তুলে বলল, তোমরা সব বল একবার "বীরাঙ্গনা মহীয়সী বুড়ী কি জয়।"

সতীশ হাসতে হাসতে বলল, "অন্ততঃ ঝণ্টুর favour-এ শ্লোগান দে।"

"ঠিক আছে—বল একবার শ্রীমান ভেড়াকান্ত ঝণ্টু কি জয়?"

সবাই হো হো করে অট্টহাসি হেসে উঠল।

মিলু বলল ওঃ ঝণ্টু তুই একেবারে ল্যাং মারতে মারতে শোক সাগরের তীরে এনে কখন যে সবাইকে পটকে ফেলেছিস খেয়ালই নেই।

হঠাৎ বেজে উঠল ঢাকের আড়াই কাঠি।

ধেনো নাচতে লাগল, "তেরে কেটে ধুম। তেরে কেটে ধুম।

ওরে কাঁসি বাজছে। কাঁই নানা। কাঁই নানা।"

ধেনো নাচছে। সতীশ বললো "হাই সন্ধি পূজো আরম্ভ হচ্ছে। রাত চারটে বাজে?"

"হ্যাঁ। ঝণ্টু আজ রাত্রিটার বাড়ি ফেরা আমাদের বারোটা বাজিয়েছে।"

মিলু দুটো হাত ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়াল, "লাগা টুইষ্ট।"

"টুইষ্ট?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ টুইষ্ট।" মিলু চিৎকার করে উঠল। "হুররে—ঢাক আর আমার মুখের কনসার্ট এক সাথে চলবে।"

ওরা তিনজন বেঁকে দাঁড়াল।

রবি বলল, "হ্যাঁরে ঝণ্টু, গল্পটা কি একদিনেই শুনেছিলি।"

"না প্রথম দিনে কিছুটা বলে—বাকীটা যেদিন ওর স্বামীর নাইট ডিউটি ল। সেদিন যেতে বলেছিল গিয়েছিলাম। অনেক রাত্রি ধরে শেষ রছিল।"

"রবি তুই আবার ঐ কথা টেনে আনছিস?"

মিলু চটে উঠল। রবি কোন কথা বলল না।

ধেনো খিঁচিয়ে উঠল, "থাও না বাপ! কেটে পড়।

যা শোনার সব তো শোনা হয়ে গেল।"

নে লাগা ট্যুইষ্ট যত সব······

ট্যুইষ্ট লাগাল তিনজনে।

ট্যা রাট্টা—ট্যাঁ! ট্যাঁ রাট্টা—ট্যাঁ।

টেঁরে রেরে টেঁরে টেরে—ট্যাঁ······

মিলুর মুখ বাজছে।

"ঝণ্টু ওঠ।"

তিনজনে নাচতে নাচতে ঝণ্টুকে জোর করে ভিড়িয়ে নিল।

"রবি?"

"না। তোরা কর। আমি দেখছি।"

"ঠিক হ্যায়।"

চারজনে উদ্দাম ট্যুইষ্ট নাচ নাচতে লাগল।

তেরে কেটে ত্রুম্। তেরে কেটে ত্রুম্। ত্রুম ত্রুম ত্রুম্।

কাঁই নানা। কাঁই নানা। গুরু গুরু ত্রুম্।

ট্যাঁ·········

হেলে বেঁকে ত্রুমড়ে মাথা ঝাঁকিয়ে শরীর কাঁপাতে কাঁপাতে নাচ চলছে।

ট্যাঁ······! সবাই পেছনে হেলে পড়ল।

চলছে—চলছে—চলছে নাচ! শুধু নাচ! উদ্দাম বল্গাহীন ট্যুইষ্ট!

"আরে সিগারেট?"

"না নেই। এই নাচ থামা।" মিলুর স্পষ্ট নির্দেশ।

নাচ থামল। ওরা পাঁচজনে এগিয়ে চলল পূজো মণ্ডপের ওখানে আলো জ্বলছে। দু একজন লোক দেখা যাচ্ছে।

পাশেই একটা দোকান খোলা। ঐখানে সিগারেট পাওয়া যাবে।

ওরা পাঁচজনে হাত নেড়ে কথা বলতে বলতে এগিয়ে চলল ঐদিকে।